গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ১০ সংখ্যা ৩০ সেপ্টেম্বর - ৬ অক্টোবর, ২০০৫ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

পৃথক রাজ্যের দাবিতে কোচবিহারের সাম্প্রতিক আন্দোলন

শোষণমুক্তির মূল লড়াইকেই বিপথগামী করবে

এস ইউ সি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৪ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

''গত ২০ সেপ্টেম্বর 'গ্রেটার কোচবিহার রাজ্য'-এর দাবিতে শান্তিপূর্ণ গণঅনশনকে কেন্দ্র করে এত প্রাণহানি ঘটত না, যদি রাজ্য সরকার শুরুতেই শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনা ও রাজনৈতিক সমাধানের পথে যেত এবং নিরস্ত্র জনগণের উপর পুলিশকে দিয়ে হামলা করে প্ররোচনা সৃষ্টি না করত। আমরা রাজ্য সরকারের এই দমনমূলক নীতির তীব্র নিন্দা করছি এবং ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত করে দোষী অফিসারদের শাস্তি দাবি করছি। সাথে সাথে আমরা মনে করি, 'গ্রেটার কোচবিহার রাজ্য' গঠনের দাবি অযৌক্তিক, ভ্রান্ত এবং বিভেদ সৃষ্টিকারী — যা জনগণের স্বার্থ ও ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকারক।

''আমরা আরো মনে করি, ভারতবর্ষে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাজনিত শোষণের কারণে জনজীবন সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে প্রচণ্ড সঙ্কটগ্রস্ত। আবার পুঁজিবাদের অসম বিকাশের ফলে কিছু কিছু রাজ্য ও রাজ্যের কিছু কিছু এলাকা অবহেলিত ও অধিকতর সঙ্কটের কবলে। উত্তরবঙ্গও তার অন্যতম। কোচবিহার সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গে চা-শিল্প ছাড়া আর কোনও শিল্পই নেই। অথচ এখানে চটশিল্প, টিম্বার ইন্ডাস্ট্রি, সিমেন্ট, পেপার মিল, ভেষজ কারখানা, ফ্রুট প্রসেসিং ইত্যাদি শিল্প গড়ে উঠতে পারত। সেচের ব্যবস্থা বিশেষ না থাকায় কৃষিও বিপর্যস্ত, যদিও কৃষিই এখানকার মানুষের প্রধান জীবিকা। শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ থেকে অধিকাংশ মানুষই বঞ্চিত। রাস্তাঘাট, যানবাহন ব্যবস্থাও অত্যন্ত দুর্বল, বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ারও কোনও বন্দোবস্ত নেই। ফলে এই অঞ্চলের জনগণের অধিকাংশই অত্যন্ত গরিব, কাজ না থাকায় বেশিরভাগ যুবকই বেকার, ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়ায় চাষীরাও দুর্দশাগ্রস্ত। কাজের খোঁজে বেকার যুবকেরা ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছে, গরিব মেয়েরা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, দেনার জ্বালায় চাষীরা আত্মহত্যা করছে। সরকারি প্রশাসন ও পঞ্চায়েতের দুর্নীতি, পুলিশি জুলুম, সি পি এম-এর দলবাজি, জবরদস্তি ও সন্ত্রাস চরমে।

''পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের মতো বর্তমান সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারও উত্তরবঙ্গের জন্য এতদিন ধরে শুধু প্রতিশ্রুতিই দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কার্যকরী কিছুই করছে না। কারণ এই দু'টি সরকারই পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে কাজ করছে। 'নর্থ বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন' ফ্রন্টের শরিক দলগুলির নিছক ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে কোন্দলের জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করছে না। এই অবস্থায় বঞ্চিত, শোষিত, চরম দুর্দশাগ্রস্ত উত্তরবঙ্গের জনগণের মধ্যে খুবই বিক্ষোভ আছে এবং থাকা স্বাভাবিকও। প্রয়োজন হচ্ছে জনজীবনের এইসব সমস্যা সমাধানের দাবি নিয়ে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের লক্ষ্যকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে লাগাতার সংঘবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলা ও পরিচালনা করা এবং সেই আন্দোলনের সপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যের জনগণের সমর্থন লাভে সচেষ্ট হওয়া। কিন্তু দুঃখ ও উদ্বেগের বিষয়, এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল জনগণের এই বিক্ষোভকে বিপথে চালনা করে খণ্ডিত বাংলাকে পুনরায় খণ্ড করে, স্বতন্ত্র উত্তরবঙ্গ রাজ্য গঠনের দাবি তুলেছে। ভারতবর্ষে ইতিপূর্বে এইভাবে ঝাড়খণ্ড, উত্তরাঞ্চল, ছত্তিশগড় এবং অবিভক্ত আসামকে ভেঙে কয়েকটি রাজ্য হয়েছে। কিন্তু তাতে জনগণের সঙ্কট বিন্দুমাত্র কমেনি, বরং বেড়েছে। লাভবান হয়েছে কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠী ও ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দলগুলি। ধর্ম-ভাষা-জাতপাত-আঞ্চলিকতার সেন্টিমেন্ট তুলে জনগণের এই বিক্ষোভগুলিকে পুঁজি করে এরা নিজেদের স্বার্থ হাসিল করা ও গদি দখলের রাজনীতি করেছে। ফলে লাভবান হয়েছে শোষক পুঁজিপতিশ্রেণী ও সি পি এম-কংগ্রেস-বিজেপি-তৃণমূল সহ সরকারি দলগুলি, যারা জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে গণআন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রামের ঐক্যকে বিনষ্ট করতে খুবই তৎপর। এভাবে মূল শত্রু পুঁজিবাদকে আড়াল করে জনগণের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সংঘর্ষের আগুন বারবার জ্বালানো হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে জাতীয় কংগ্রেসের বুর্জোয়া আপসকামী নেতৃত্ব ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত মানবতাবাদের চর্চা না করে ধর্ম, জাতপাত, প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা ও সামন্ততান্ত্রিক নানা ঐতিহ্যের সাথে আপস করে এগুলিকে টিকিয়ে রেখেছে এবং প্রয়োজনে এগুলিকে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে।

''এটাও জানা যাচ্ছে, একদিকে যেমন কংগ্রেস, তৃণমূল ও বিজেপি এই আন্দোলনকে উস্কানি ও মদত দিয়েছে, তেমনি শাসক সি পি এম ও বিজেপি-র বিভিন্ন স্তরের প্রাক্তন ও বর্তমান নেতা-কর্মী এই আন্দোলন সংগঠনে ভূমিকা নিয়েছে, যেটা এই দুই দলের নেতাদের অজানা থাকার কথা নয়। ফলে দলীয় সঙ্কীর্ণ ভোটের স্বার্থে এরা এই আন্দোলনকে যে ব্যবহার করতে চেয়েছে, এটা পরিষ্কার। হয়তো তাঁরা বুঝতে পারেননি, এটা শেষপর্যন্ত এতদূর গড়িয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।

উপযুক্ত রাজনৈতিক চেতনার অভাবে ও সি পি এম বামপন্থাকে কলঙ্কিত করার ফলে এবং বিপ্লবী সংগ্রাম ও গণআন্দোলনের উপযুক্ত শক্তি না থাকার সুযোগ নিয়ে এরা জনগণকে এইভাবে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করছে। পুঁজিপতিশ্রেণী, সরকারি দলগুলি ও স্বার্থান্বেষী মহলের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জনগণকে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে এবং জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে উপযুক্ত বিপ্লবী নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে।''

কৃষি বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে ও কৃষক উচ্ছেদ করে উপনগরী বানাবার প্রতিবাদে ২৬ সেপ্টেম্বর ইউনিভার্সিটি ইন্সিটিউট হলে কৃষক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখছেন পশ্চিমবঙ্গ কে কে এম এস-এব প্রেসিডেন্ট কমরেড প্রতিভা মুখার্জী

সালিমকে জমি ঃ কৃষকদের ঠকাতেই শিল্পায়নের অজুহাত

সরকারের নগরায়নের কল্যাণে পশ্চিমবাংলার অসংখ্য চাষী পরিবার ইতিমধ্যেই ভিটে-মাটি ও জমিচ্যুত হয়ে পথের ভিখারিতে পরিণত হয়েছে, আরও হাজার হাজার পরিবার ভিটে ও জমি হারাবার আতঙ্কে দিন গুণছে। রাজ্যের সি পি এম সরকার তাদের জমি দখল করে সেখানে গড়ে তুলবে বিলাস-বৈভবের উপনগরী। ইন্দোনেশিয়ার সালিম গোষ্ঠীর সঙ্গে সরকারের চুক্তিও হয়ে গেছে সেই মর্মে। সরকার বাহাদুর তার প্রজা চাষীদের জানিয়ে দিয়েছে, হোক তোমার ঐটুকু জমি সম্বল, হোক না দু-ফসলি বা চারফসলি জমি, তবু 'ওটা দিতে হবে।' দক্ষিণ ২৪ পরগণার ২৬৭০ একর জমি দখল করে সেখানে উপনগরী গড়ে উঠবে। এছাড়াও পশ্চিম হাওড়ার বম্বে রোড ও হাওড়া-আমতা রোডের সংযোগস্থলে মানুষের ঘরবাড়ি ও জমি উচ্ছেদ করে আর একটি উপনগরী গড়ার প্রকল্প শুরু হয়েছে। হুগলির ডানকুনিতে একটি উপনগরী গড়ার জন্য ৫০১০ একর জমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য জেলাতেও এমনভাবে সরকার কৃষকের জমি নেবে বলে সংবাদে প্রকাশ পেয়েছে। ইতিপূর্বে রাজারহাটের ৯০০০ একর জমি দখল করে নিউটাউন গড়ে উঠেছে এবং বানতলায় চর্মনগরী গড়ার জন্য ৫৬৫.১৬ একর জমি দখল করা হয়েছে।

এই বিপুল পরিমাণ চাষের জমি, বাগান ও বাস্তু-ভিটে থেকে যে অসংখ্য পরিবার উচ্ছেদ হয়ে

পাঁচের পাতায় দেখুন

পুরুলিয়া

খরা ঘোষণা ও সেচের দাবিতে আড়ষায় পথ অবরোধ

আড়ষা এলাকায় খরা ঘোষণা, সেচের ব্যবস্থা, অন্ত্যোদয় ও অন্নপূর্ণা যোজনার কার্ড বিলি করা, আড়ষা থেকে পুরুলিয়া রাস্তাটি সংস্কার, পুরুলিয়া থেকে ঝালদা ভায়া আড়ষা রুটে সরকারি বাস চালু করা, আড়ষা হাসপাতালে চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়ানো, আড়ষায় টেলিফোন যোগাযোগের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি দাবি নিয়ে এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে পাঁচ শতাধিক মানুষ ২৫ আগস্ট ভোর ৫টা থেকে টানা ৫ ঘণ্টা ধরে পুরুলিয়া আড়ষার গুরুত্বপূর্ণ দুটি রাস্তার সংযোগস্থল আহাড়রা মোড়ে রাস্তা অবরোধ করেন। সকাল থেকে অবরোধের ফলে বহু বাস, ট্রাক, ট্যাক্সি, ট্রেকার আটকে যায় এবং ঐসব আটকে যাওয়া বাস ট্রেকারের যাত্রীরাও অবরোধে সামিল হন।

সকাল ৮টার মধ্যেই সার্কেল ইন্সপেক্টর সহ বিশাল এক পুলিশ বাহিনী অবরোধ তুলতে এলে অবরোধকারীরা তাঁদের দাবিগুলির প্রতি প্রশাসনের লিখিত প্রতিশ্রুতি চান। এরপর বেলা ১১টা নাগাদ আড়ষা ব্লকের যুগ্ম বিডিও লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। এই অবরোধে নেতৃত্ব দেন এস ইউ সি আই আড়ষা ব্লকের সংগঠক এবং পুরুলিয়া জেলা বিড়ি শ্রমিক সংঘের সম্পাদক কমরেড রঙ্গলাল কুমার। ১৫ দিনের মধ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ না নেওয়া হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে কমরেড কুমার ঘোষণা করেন।

দার্জিলিং

বাতাসীতে ছাত্র সম্মেলন

শিক্ষার সর্বস্তরে ফি-বৃদ্ধি, ডোনেশন, বেসরকারীকরণ, কান্তি বিশ্বাস কমিটির দ্বারা কলেজ স্তরে সেল্ফ ফিনান্সিং কোর্স চালুর সুপারিশ এবং ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে জীবনশৈলী শিক্ষার নামে যৌন শিক্ষা চালুর প্রতিবাদে গত ২১ আগস্ট এ আই ডি এস ও'র বাতাসী আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

পতাকা উত্তোলন এবং শহীদবেদীতে মাল্যদানের পর মূল প্রস্তাব পাঠ করেন কমরেড মনোজ রায়। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ বাবলু মির্ধা, কৌশিক দত্ত, হরেন সিং, বিশ্বজিৎ দত্ত প্রমুখ। বর্তমান শিক্ষার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন কমরেড শোভা কার্জি। ছাত্র আন্দোলনকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই দার্জিলিং জেলা কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর পাল। এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দলের বাতাসী ইউনিট-এর পক্ষ থেকে কমরেড হরিপ্রকাশ সরকার।

কমরেড বাবলু মির্ধাকে সভাপতি এবং কমরেড মনোজ রায়কে সম্পাদক করে ৩০ জনের আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়।

শিশুশিক্ষা সহায়ক-সহায়িকাদের বিক্ষোভ অবস্থান

৮ সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলার ১৬টি ব্লক থেকে আগত প্রায় দুই হাজার সহায়ক শিক্ষক বহরমপুরে জেলা-শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ অবস্থানে সামিল হন। তাঁদের দাবি স্থায়ী নিয়োগ পত্র দিতে হবে, ছাঁটাই করা চলবে না, বেঁচে থাকার মত সাম্মানিক ভাতা দিতে হবে, সার্ভে, সেনশাস প্রভৃতি কাজে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়ক-সহায়িকাদের নিতে হবে। চুক্তিতে নিয়োগ যে কত ভয়ঙ্কর এই কেন্দ্রের কর্মরত সহায়ক শিক্ষক-শিক্ষিকারা তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন। প্রতি বছরই সরকার নির্দেশিকার পরিবর্তন ঘটিয়ে নানা অজুহাতে ছাঁটাইয়ের হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। প্রাইমারি শিক্ষকদের সমান পরিশ্রম করিয়েও বেতন দেওয়া হয় মাত্র এক হাজার টাকা। এই টাকার পুরোটাও আবার তারা পান না। ব্যাঙ্ক কেটে নেয় কিছু টাকা, শিক্ষা কেন্দ্রের সম্পাদক সভাপতিকে দিতে হয় একদিনের মজুরি। প্রতিবাদ করলেই নেমে আসে ছাঁটাইয়ের খড়্গ। সেজন্যই প্রয়োজন সংগঠিত প্রতিবাদ যা ছাঁটাইয়ের ষড়যন্ত্রকে বানচাল করতে পারে। তাই মুর্শিদাবাদে গড়ে উঠেছে শিশু শিক্ষাকেন্দ্র সহায়ক-সহায়িকা সমিতি। এই সমিতির পক্ষ থেকে এদিন অতিরিক্ত জেলা শাসককে সমস্যার কথা জানালে তিনি বলেন, 'এখানে মানবিকতার কোন প্রশ্ন নেই, সরকার যেমন ঠিক করেছে তেমনি চলবে।' মুখ্যমন্ত্রী কথিত 'সংবেদনশীল সরকারের' এই হল চেহারা। এই বিক্ষোভ অবস্থানে নেতৃত্ব দেন সভানেত্রী অন্নপূর্ণা মণ্ডল, কার্যকরী সভাপতি জিয়ারুল হক এবং সম্পাদিকা গুলশনারা ইভা, সহসভানেত্রী গীতা ভট্টাচার্য প্রমুখ।

বিড়ি শ্রমিকদের ডেপুটেশন, দাবি আদায়

হাবড়া ঃ রাজ্যের সিপিএম ফ্রন্ট সরকার দীর্ঘ ২৮ বছরেও বিড়ি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির ব্যবস্থা করতে পারল না। শ্রমিকের স্বার্থের কথা বলতে বলতেই তাদের শ্রমিকস্বার্থবিরোধী ভূমিকার জন্য মালিকরা শ্রমিকদের ঠকাতে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত বিড়ি শ্রমিকদের সংগ্রামী সংগঠন বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশন-এর হাবড়া শাখা ৭ সেপ্টেম্বর ১নং ব্লক অফিসে ডেপুটেশন দেয়। বিড়ি শ্রমিকদের জন্য সরকার ঘোষিত মজুরি চালু, প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু, সহজ শর্তে পরিচয় পত্র দেওয়া, বিড়ি শ্রমিকদের নাম বিপিএল তালিকাভুক্ত করা, হাবড়ায় মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট চালু করা প্রভৃতি দাবিতে ২০০ বিড়ি শ্রমিক এই ডেপুটেশনে অংশগ্রহণ করে। বিডিও ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডেকে মজুরিবৃদ্ধির উদ্যোগ নেবেন বলে জানান। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের হাবড়া শাখার সম্পাদক কমরেড সুকুমার চক্রবর্তী। বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস।

বালুরঘাট ঃ সংগঠনের বালুরঘাট শাখার পক্ষ থেকে ৩০ আগস্ট জেলাশাসক ও সহকারী লেবার কমিশনারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সভাপতি কমরেড সাগর মোদক ও সম্পাদিকা কমরেড শিপ্রা দেবনাথ। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১০ সেপ্টেম্বর ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয় এবং এক হাজার বিড়ি প্রতি চার টাকা মজুরি বৃদ্ধি করা হয়। বৈঠকে পি এফ, চিকিৎসা, পরিচয়পত্র, মনিটরিং কমিটি গঠন প্রভৃতি দাবিগুলি আদায় হয়।

১০ সেপ্টেম্বর বালুরঘাটে বিড়ি শ্রমিকদের মিছিল

জলপাইগুড়ি

পাহাড়পুরে বাস অবরোধ, দাবি আদায়

জলপাইগুড়ি জেলার পাহাড়পুর বাস স্টপে স্কুলে যাওয়ার সময়ে বাস কন্ডাক্টররা বাস না থামিয়ে সরাসরি শহর অভিমুখে চলে যাওয়ায় স্কুলে যেতে ছাত্রছাত্রীদের প্রায়ই দেরী হয়ে যায়। এই বিলম্বের জন্য স্থানীয় ৬ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিতে পারেনি। ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকেরা এ আই ডি এস ও'র নেতৃত্বে ২৯ আগস্ট ঐ রুটের বাস থামিয়ে দু'ঘণ্টা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। জনরোষ বুঝতে পেরে পরের দিন থেকেই বাস থামাতে শুরু করে। দাবি আদায়ে এলাকার লোকজন সংঘশক্তির প্রয়োজন বুঝতে পারে। সংগঠনের পাহাড়পুর ইউনিটের সহসম্পাদক বাদল রায়, বিশ্বজিৎ তন্ত্র, সূর্য রায়, কল্যাণ তন্ত্র, সুপ্রভা তন্ত্র এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

এ আই কে কে এম এসের ডেপুটেশন

কোচবিহার

চাষীদের ২৫ বছরের বকেয়া খাজনা ও সেস মকুব, ইনফরমেশন ও নামজারির জন্য ফর্ম বিনামূল্যে প্রদান ও খাস জমির পাট্টার দাবিতে এবং জমির সিলিং প্রথা বাতিল, চুক্তিচাষ আইন সিদ্ধ করা, জমিতে সার্ভিস চার্জ চালু করা, ইনফরমেশন ও নামজারির ক্ষেত্রে ফি বৃদ্ধি, ফুলবাগান-ফলের বাগান-বাঁশ ঝাড় -পানের বরজ - পুকুর প্রভৃতি ক্ষেত্রে বর্ধিত খাজনা ও সেস ৫৬৪ টাকা আদায়ের প্রতিবাদে সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের পক্ষ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর মাথাভাঙা ২নং ব্লক ভূমি ও ভূমিসংস্কার আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। আধিকারিক দাবি সমূহের যৌক্তিকতা মেনে নেন এবং বলেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়গুলি জানাবেন এবং পাশাপাশি তাঁর এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়গুলি গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাস দেন। পরে এক সুসজ্জিত মিছিল ঘোকসাডাঙা স্টেশন বাজার ও পুরানো বাজার পরিক্রমা করে। মিছিল ও ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন স্থানীয় কৃষক নেতা কমরেডস সাগর চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ বর্মন, শ্রীকান্ত দাস ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বর্ধমান

গ্রামীণ খেতমজুরদের সারা বছর কাজ, ন্যায্য মজুরি, পরিচয় পত্র প্রদান, সার-বীজ-ডিজেলের দাম কমানো ও ফসলের ন্যায্য দামের দাবিতে এবং পঞ্চায়েতী ট্যাক্স চালু করা, দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের কৃষি জমি দেওয়ার প্রতিবাদে বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম থানার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে এ আই কে কে এম এসের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর উত্তর রামনগর অঞ্চলে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ১৪ সেপ্টেম্বর বেরেণ্ডা অঞ্চলের ডেপুটেশনে কমরেডস মনসা মেটে, বোরহান মণ্ডল, সেখ মোস্তাফা প্রমুখের নেতৃত্বে শতাধিক কৃষক অংশগ্রহণ করেন। বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সুনীল পুরকাইত।

পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে অবস্থান-বিক্ষোভ

বীরভূম ঃ সিপিএম সমর্থিত কেন্দ্রের ইউপিএ সরকারের নতুন করে পেট্রল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ৭ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই সিউড়ি লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে পথসভা করা হয়। বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই সিউড়ি লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড মানস সিংহ। পথচলতি সাধারণ মানুষ আগ্রহের সঙ্গে দাঁড়িয়ে বক্তব্য শোনেন। সভাশেষে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী মণিশঙ্কর আইয়ারের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

কোচবিহার ঃ পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ১৯ সেপ্টেম্বর মাথাভাঙায় রেডক্রস অফিসের সামনে সারাদিনব্যাপী গণঅবস্থানের কর্মসূচি পালিত হয়। বক্তব্য রাখেন, কমরেডস্ প্রদীপ দে, হরিশঙ্কর রায়ডাকুয়া, মির্জা কারিমুল হাসান, মানিক বর্মন, সাগর চৌধুরী, লক্ষ্মণ রায় প্রমুখ। অবস্থান শেষে সুসজ্জিত মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

ঝাড়খণ্ড ঃ ১০ সেপ্টেম্বর **জামশেদপুরে** বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। বিক্ষোভে অধ্যাপক পল্লবকান্তি বিশ্বাস বলেন, বিজেপি'র এন ডি এর মতই কংগ্রেস-সিপিএম প্রমুখ দলগুলির ইউপিএ সরকার পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়িয়েই চলেছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ট্যাক্স কমালেই পেট্রল-ডিজেলের দাম অর্ধেক হয়ে যায়। জনবিরোধী ইউপিএ সরকারের পেট্রলিয়াম মন্ত্রীর কুশপুত্তলিকায় অগ্নিসংযোগ করেন দলের জেলা সম্পাদক কমরেড রণজিৎ মোদক। ৯ সেপ্টেম্বর **বোকারোতে** প্রতিবাদ মিছিলে নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক কমরেড আর এস শর্মা, পি দুবে, মোহন চৌধুরী, শঙ্কর সিংহ প্রমুখ। ১৫ সেপ্টেম্বর **ধানবাদের** ধরনায় বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ জগদীশ আচার্য, আর কে তেওয়ারী, অনিল বাউরী।

শিক্ষা-স্বাস্থ্যে নয়, অস্ত্র কেনায় ভারত এখন শীর্ষে

সম্প্রতি আমেরিকান কংগ্রেস নিয়োজিত একটি সংস্থার রিপোর্টে দেখা গেছে, ২০০৪ সালে বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানিতে উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ভারত শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। বিভিন্ন দেশের সাথে আরও যে অসংখ্য চুক্তি ইতিমধ্যে হয়ে রয়েছে তাতে আগামী দিনেও ভারত শীর্ষ স্থানে থাকবে। যেমন ৬টি ফরাসি স্করপিয়ন সাবমেরিন কেনার জন্য অতি সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্স সফরে গিয়ে সে দেশের প্রেসিডেন্টের সাথে চূড়ান্ত চুক্তি করে এলেন। ভারতীয় মুদ্রায় এগুলির মূল্য ১৩,০০০ কোটি টাকা। বায়ুসেনার জন্য ১২৬টি ফরাসি বহুমুখী কমব্যাট ফাইটার এয়ারক্রাফট কেনার জন্য ৫০০ কোটি ডলার অর্থাৎ ২৪,০০০ কোটি টাকার চুক্তিও কার্যকর হতে চলেছে। ২০০৪ সালে ভারত মোট অস্ত্র কিনেছে ৩৩,৪৭২ কোটি টাকা মূল্যের। সেখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী সৌদি আরব ও চীন যথাক্রমে ১৩,৯২০ কোটি ও ১০,৫৬০ কোটি টাকা মূল্যের অস্ত্র আমদানি করেছে। ভারতের আমদানির পরিমাণ এই দুই দেশের সম্মিলিত পরিমাণের থেকেও বেশি। উল্লেখ্য যে, ২০০২ সালে ভারত অস্ত্র আমদানিতে ছিল পঞ্চম স্থানে এবং ২০০৫ সালে অস্ত্র আমদানি খাতে বরাদ্দের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪,৪৭২ কোটি টাকা। অর্থাৎ অস্ত্র ক্রয় খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখার্জী জানিয়েছেন, ''বিপুল অঙ্ক মূল্যের এই অস্ত্র কেনা ভারত সরকারের হঠাৎ নেওয়া কোন সিদ্ধান্তের ফল নয়, ২০০১ সালেই সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে অস্ত্র কেনার এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গৃহীত হয়।'' তিনি বলেন, ''এই উদ্দেশ্যেই আমি অর্থদপ্তরকে ২০০৪-০৫ সালের সামরিক বাজেট বাড়িয়ে ৭৭,০০০ কোটি টাকা করার কথা বলি। ২০০৫-০৬ সালের বাজেটে আরও ৬,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ বেড়ে তা ৮৩,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।'' প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর এই স্বীকারোক্তি থেকে বোঝা যায়, তিনি বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ আমলের সামরিক নীতিকেই কার্যকর করছেন। অর্থাৎ এন ডি এ-র নীতিই আজ ইউ পি এ-র নীতি। কংগ্রেস মুখে যতই বিজেপির বিরোধিতা করুক, নীতিগতভাবে উভয়ের মধ্যে যে কোন পার্থক্য নেই তা এর দ্বারা আবারও স্পষ্ট হল। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার পর থেকে যখনই প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বাড়ানো হয়েছে, তখনই সরকার সামরিক ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের ধূয়ো তুলেছে। অথচ দেশের যে জনগণকে বঞ্চিত করে সমর সজ্জার এই বিপুল আয়োজন, কোন সরকারই তাদের জীবন মানের উন্নয়নের জন্য ন্যূনতম আধুনিক ব্যবস্থা, তথা আধুনিক চিকিৎসা বা আধুনিক শিক্ষার কথা ভাবেনি। ২০০৫-০৬ সালে বাজেটের ২২ শতাংশই যেখানে ব্যয় করা হচ্ছে সামরিক খাতে, সেখানে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় মাত্র ০.৯ শতাংশ। তাহলে সরকারি এই নেতা-মন্ত্রীদের কাছে দেশ মানে কি শুধু একটা ভূখণ্ড— নদী, নালা, মাটি, পাহাড়, জঙ্গল আর জল ? দেশ মানে যদি দেশের মানুষ হয়, তবে সেই মানুষগুলিকে চরম দুরবস্থার মধ্যে রেখে কীভাবে দেশ রক্ষা হবে! কোন লড়াই কি শুধু অস্ত্র দিয়ে হয়? যদি সেই অস্ত্র যারা চালাবে সেই মানুষগুলি দেহ-মনে সবল না হয়? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েতের উদাহরণ দেখিয়ে দিয়েছে, দেশের মানুষ যদি উন্নত আদর্শকে ভিত্তি করে দেশপ্রেমের আবেগে উদ্বুদ্ধ হয়ে কোমর সোজা করে দাঁড়ায় তবে শত্রু যত শক্তিশালীই হোক না কেন, তাদের পরাজিত করতে পারে না।

আজ যখন দেশের সরকারি নেতা-মন্ত্রীরা হয় কথায় নয় কথায় বিশ্বকে 'গ্লোবাল ভিলেজ' বলে উল্লেখ করেন এবং যখন প্রতিবেশী চীন ও পাকিস্তানের সাথেও পারস্পরিক সম্পর্ক প্রধানমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীদের ঘন ঘন যাতায়াত এবং বৈঠকের মধ্য দিয়ে আগের থেকে অনেক উন্নত হয়েছে বলে উভয় দেশের নেতারাই বলছেন ; পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুসারফ এদেশে এলেন, দুদেশের মধ্যে বাস চলছে, ট্রেন চলবে, বন্দি বিনিময় হল, বাণিজ্যিক লেনদেন চলছে, অর্থাৎ সীমান্তে যখন যুদ্ধ উত্তেজনা নেই, তখন এই বিপুল অস্ত্রসজ্জা কীসের জন্য? সরকার বলুক কোন্ সে শত্রু, যার জন্য দেশের কোটি কোটি মানুষকে বুভুক্ষু, নিরক্ষর এবং রোগজর্জর অবস্থায় রেখে অস্ত্র কেনায় এত বিপুল টাকা ঢালতে হবে ? তাহলে এই অস্ত্রসজ্জার উদ্দেশ্য কী ? এর উদ্দেশ্য হল, প্রথমত, এই অস্ত্র সংগ্রহের দ্বারা দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে বাজার দখলের লক্ষ্যে ভারতের নিজস্ব প্রভাবাধীন অঞ্চল বাড়াবার সম্প্রসারণবাদী ঝোঁক চরিতার্থ করা। বাস্তবে রাষ্ট্রের বকলমে ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণীর অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যেই এই সামরিক শক্তি প্রদর্শন। মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কায় সেনা পাঠানো, নেপালের গণতন্ত্রবিরোধী সরকারকে অস্ত্র ও সেনা সাহায্য এই আধিপত্যবাদেরই নমুনা। সম্প্রতি ভারত-মার্কিন প্রতিরক্ষা চুক্তির মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলে কর্তৃত্ববাদের মার্কিন ছাড়পত্রও ভারত আদায় করেছে। দ্বিতীয়ত, অস্ত্র লেনদেনের চুক্তির মধ্য দিয়ে উভয় দেশের পুঁজিপতিদের মধ্যে যে তথাকথিত সখ্যতা গড়ে ওঠে, তাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিরক্ষা বহির্ভূত আরও অসংখ্য চুক্তি হয়ে থাকে যার দ্বারা দেশিয় কর্পোরেট সেক্টরগুলির মুনাফার স্বার্থই চরিতার্থ হয়। তাই দেখা যায়, যখনই প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রীরা বিদেশ সফরে যান তখনই সাথে যায় উড়োজাহাজ বোঝাই শিল্পপতিরা। প্রধানমন্ত্রীর ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ ভ্রমণে যেমন এ জিনিষ দেখা গেল, তেমনই এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সিঙ্গাপুর সফরেও অন্যথা ঘটেনি। দেশের প্রথম সারির ৩০ জন শিল্পপতি এই সফরে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। সর্বোপরি, অস্ত্র কেনার মধ্য দিয়ে মন্ত্রী থেকে শুরু করে স্তরে স্তরে নেতা, সামরিক অফিসার এবং আমলারা অস্ত্র কোম্পানী ও অন্যান্য তরফ থেকে মোটা অঙ্কের দালালি পেয়ে থাকেন। এই দালালির লোভে অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত দামের থেকেও বেশি দামে অস্ত্রের বরাত দেওয়া হয়। অস্ত্র কেনার ক্ষেত্রে এই দালালির আকর্ষণও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিরক্ষা বিভাগের স্তরে স্তরে এই দুর্নীতির ভুরি ভুরি উদাহরণ আজ প্রকাশ্যে এসে গেছে। বোফর্স অস্ত্র কেলেঙ্কারিতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ৬৪ কোটি টাকা ঘুষ নেওয়ার কথা আজ আর কারও অজানা নয়। তেমনই অস্ত্র আমদানি সংক্রান্ত তেহলকা কেলেঙ্কারিতে এন ডি এ আমলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্নাণ্ডেজ থেকে শুরু করে বিজেপির তাবড় নেতাদের জড়িয়ে পড়ার কথাও আজ সকলেরই জানা। সৈন্যদের মৃতদেহ বহন করার জন্য যে কফিন ব্যবহার করা হয়, সৈন্যরা যে বুট বা প্রবল ঠাণ্ডার হাতে থেকে বাঁচতে বিশেষ ধরনের পোশাক ব্যবহার করেন— এসব কেনার ক্ষেত্রেও বিপুল অঙ্কের দালালি নেওয়ার কথা আজ প্রকাশিত। একথা জলের মত পরিষ্কার যে, যতই অস্ত্র কেনা হবে ততই মন্ত্রী-আমলাদের পোয়া বারো — তাতে দেশের কোটি কোটি দরিদ্র নিরন্ন মানুষ, যাদের ক্ষুধার অন্ন কেড়েই এই অস্ত্র কেনা, তারা অনাহারেই থাক বা বিনা চিকিৎসাতেই মরুক!

দেশের গরিব মানুষ স্বাধীনতা চেয়েছিল দুবেলা পেট পুরে খেতে, চাষীরা চেয়েছিল ফসলের ন্যায্য দামটুকু— যাতে অন্তঃত সংসার প্রতিপালন করা যায়। তাঁদের কারোর কোন স্বপ্নই সফল হয়নি। স্বাধীনতার ছ'দশক পরেও দেশের যুবসমাজ আজ তীব্র বেকার সমস্যায় জর্জরিত, বন্ধ কারখানার বেকার শ্রমিক পেটের জ্বালায় সপরিবারে আত্মহত্যা করছে, চাষী ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে জড়িয়ে পড়ছে মহাজনের ঋণের জালে, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে পুকুর, খাল, বিলের জল পান করে রোগে ভুগছে দেশের বহু কোটি মানুষ, আর্সেনিকের মারণ বিষে উজাড় হয়ে যাচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম। অর্থের অভাবের অজুহাতে সরকার হাসপাতালগুলি বেসরকারি মালিকদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। শিক্ষাখাতে ব্যয় কমিয়ে দুর্মূল্য করছে শিক্ষাকে। শিশুমৃত্যুতে, নিরক্ষরতায় দেশ আজ বিশ্বে শীর্ষস্থানে। রাষ্ট্রসংঘের মানব উন্নয়ন সূচক অনুযায়ী, দেশের ৮০ ভাগ সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবনযাত্রার মানের নিরিখে বিশ্বের ১৮৭টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১২৭তম। ইউনিসেফের ২০০৫ সালের রিপোর্ট বলছে, ভারতের লক্ষ লক্ষ শিশু স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয় জল ও বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত।

পরাধীন দেশে আমাদেরই এক কবি আশা প্রকাশ করেছিলেন, 'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'। নানা মনীষী, স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ বা তার শত সহস্র সৈনিক— যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য নিঃশেষে প্রাণ দিয়ে গেছেন, তাঁরাও চেয়েছিলেন, এক নতুন ভারত গড়ে তুলতে। কিন্তু সে কোন ভারত! যে ভারত স্বাধীন; যেখানে শাসকের রক্তচক্ষু নেই, যেখানে মানুষ সম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে বাঁচবে; অনাহার থাকবে না, অশিক্ষা থাকবে না, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু থাকবে না, ডেঙ্গু, কলেরা, ম্যালেরিয়া, প্লেগ মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়বে না; একের শ্রম অন্যে আত্মসাৎ করে পুঁজির পাহাড় গড়বে না।

স্বাধীনতার ৫৮ বছর পরেও সাধারণ মানুষের জীবনের দুঃসহ এই অবস্থা নিশ্চয় কোন দেশকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিতে পারে না। অবশ্য দেশের বর্তমান শাসকদের কাছে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ এই সমস্ত সমস্যাগুলি থেকে দেশের মানুষকে মুক্ত করা নয়, সমস্যা জর্জরিত এই মানুষগুলিরই রক্ত জল করা অর্থে দেশকে অস্ত্রসজ্জিত করে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি-মন্ত্রী-আমলার উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করাই তাদের কাছে দেশের শ্রেষ্ঠতার পরিচায়ক। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এর অন্যথা আশা করাই বৃথা ; আশা করলে এই পুঁজিবাদকে ভাঙতে হবে, গড়তে হবে নতুন সমাজ, নতুন দেশ।

জমি সংক্রান্ত বিরোধ মেটাবার ক্ষমতা পঞ্চায়েতকে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান

— প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৫ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন —

''সরকারি প্রশাসনের পরিবর্তে পঞ্চায়েতকে জমি সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব দেওয়ার সরকারি পদক্ষেপ গ্রামাঞ্চলে সি পি এম-এর নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং বিরোধী দল ও জনগণের শক্তিকে আরও দুর্বল করারই আরেকটি মারাত্মক ষড়যন্ত্র।

''এমনিতেই সি পি এম পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীদের দাঁড়াতে না দিয়ে, পেশীশক্তির জোরে বুথ দখল ও রিগিং করে অধিকাংশ পঞ্চায়েত দখল করে নিয়েছে। এই পঞ্চায়েতের শক্তিকে ব্যবহার করে প্রশাসন ও পুলিশকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জো হুকুমে পরিণত করে সি পি এম বহু জায়গায় বিরোধীদের জমিচ্যুত করছে, প্রকৃত বর্গাদার ও পাট্টাধারীদের উচ্ছেদ করছে, চাষের আইনসঙ্গত অধিকার ও পক্ষে কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত চাষীকে চাষ করতে না দিয়ে নিজেদের লোককে দিয়ে করাচ্ছে, জমিতে মজুর বন্ধ করে দিচ্ছে। এই অবস্থায় সম্মিলিত প্রতিবাদ ও আন্দোলনের চাপে যতটুকু প্রশাসনিক সাহায্য আদায় করা যেত, পঞ্চায়েতের হাতে এই সর্বময় কর্তৃত্ব দিয়ে এটাও বন্ধ করা হচ্ছে। সি পি এম যত জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে তত বিরোধীদের নির্মূল করে ভোটের নামে প্রহসন ঘটিয়ে সরকারি ক্ষমতা গায়ের জোরে রক্ষার জন্য সালিশী বিলের মতো এইসব গণতন্ত্রবিরোধী ষড়যন্ত্র করছে।

''আমরা জনবিরোধী এই স্কিমের তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং গ্রামের জনগণকে পঞ্চায়েতের হাতে জমি সংক্রান্ত বিরোধ মেটানোর ক্ষমতা না দেওয়ার দাবিতে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।''

আবার বাসভাড়া বাড়ানো হল মালিক-সরকার সমঝোতার ভিত্তিতে

— প্রভাস ঘোষ

রাজ্য সরকার কর্তৃক পরিবহণের ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এস ইউ সি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২২ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

''পরিবহণের ভাড়া বাড়িয়ে রাজ্য সরকার পুজোর মুখে জনজীবনের উপর আবার একটা আর্থিক আক্রমণ হানল। এই উদ্দেশ্যে প্রতিবারের মতো এবারও বোঝাপড়া করে বাসমালিকদের দিয়ে ধর্মঘট করানো হল।

''এটা পরিষ্কার, বিশ্ববাজারে তেলের দাম বাড়লেও এদেশে যে দামে তেল বিক্রি হচ্ছে সেটা প্রায় অর্ধেক হয়ে যায় যদি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ট্যাক্স ও সেস প্রত্যাহার করে নেয়। কিন্তু কেউই তা করছে না।

''তেলের যা দাম তাতে মালিকদের অত্যধিক লাভের পরিমাণ যথার্থই কিছু কমছে, না তাদের দাবি অনুযায়ী লোকসান হচ্ছে, সেটা বিচার করার জন্য নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন না করে এবং যাত্রীদের মতামত না নিয়ে রাজ্য সরকার ভাড়া বাড়িয়ে দিল। আমরা মনে করি, ভাড়া বাড়ানোর কোনও প্রয়োজন ছিল না। অন্যদিকে শ্রমিকদের নির্দিষ্ট বেতন না দিয়ে কমিশন প্রথা চালু রাখায় প্রায় প্রতিদিনই ওভারটেক ও বেপরোয়া ড্রাইভিং-এর ফলে বহু যাত্রীর আহত হওয়ার ঘটনা ও প্রাণহানি ঘটছে এবং যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যেরও ন্যূনতম কোনও ব্যবস্থা নেই। আমরা দাবি করছি, বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার করতে হবে ; ডিজেলের উপর ট্যাক্স ও সেস নেওয়া বন্ধ করতে হবে ; যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে হবে ; ওভারটেক ও বেপরোয়া ড্রাইভিং বন্ধ করতে হবে এবং শ্রমিকদের নির্দিষ্ট বেতন দিতে হবে।

''আমরা জনগণকে যাত্রী কমিটি গঠন করে বর্ধিত ভাড়া বয়কট করার আবেদন জানাচ্ছি।''

সকল বিষয়ে পিছিয়ে পশ্চিমবঙ্গ নারীপাচারে শীর্ষস্থানে

সম্প্রতি এ রাজ্যে ব্যাপকহারে নারীপাচার বেড়েছে। প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও নারীপাচারের মত পৈশাচিক ঘটনা ঘটে চলেছে। অভিভাবক সহ সমস্ত সাধারণ মানুষ এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন। কয়েক বছর ধরে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তরবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলা ছাড়াও খোদ কলকাতাতেও নারীপাচারের ঘটনা বেড়ে চলেছে। সাধারণত অভাবী মেয়েদের কাজ দেওয়ার নাম করে অথবা বিয়ে দেবার প্রলোভন সৃষ্টি করে দালালরা পাচার করছে। বর্তমানে এই ব্যাপারে মুর্শিদাবাদ জেলা শীর্ষস্থানে। এ জেলার হরিহরপাড়া, রাণীনগর-১, রাণীনগর-২, জলঙ্গি, ভগবানগোলা-১, ভগবানগোলা-২, লালগোলা, বেলডাঙা, বহরমপুর, লালবাগ, ডোমকল, নওদা সহ প্রায় ১৫টি ব্লক থেকে কয়েক বছরে সহস্রাধিক মেয়ে পাচার হয়েছে। গত ২০ আগস্ট হরিহরপাড়া থানার স্বরূপপুর গ্রাম থেকে হারিয়ে যাওয়া ১২ বছরের বিউটি খাতুনকে তিন মাস পর কাশ্মীর থেকে উদ্ধার করা হয়। টুটুল সেলিম নামে এক যুবক বিয়ের নাম করে কাশ্মীরের পুলওয়ারা জেলায় মর্জিনা বিবির হাতে ২০,০০০ টাকায় তাকে বিক্রি করে। মর্জিনা বিবি পরে ৭৫ বছরের বৃদ্ধ হাসান হাজির কাছে ৩৫ হাজার টাকায় তাকে বিক্রি করে। বহরমপুর থানা এলাকার ফরিদাবিবির কাশ্মীরে বিয়ে হয়েছে। ঘটনাটি ফরিদাবিবির নজরে আসায় তিনি তা মেনে নিতে পারেন নি। তিনি হরিহরপাড়ায় এই নাবালিকা সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। পরে তাকে পুলিশ উদ্ধার করে। ২৩ আগস্ট ডোমকল থানার ১৭ বছরের নাফিসাকে হরিয়ানা থেকে উদ্ধার করা হয়। হরিহরপাড়া থানার শতাধিক পাচার হওয়া মেয়েদের মধ্যে রাকিনা খাতুন, সেলিনা খাতুন, ফরিদা বিবি, বিউটি খাতুন, তুলা দাম, মিঠু মাল, সাকিলা খাতুন, সীমা মাল, পাহাড়িয়া, আনারকলি সহ ২০ জন মেয়ে উদ্ধার হয়েছে। রাণীনগরের মানোয়ারা, বিলকিস, নার্গিস, সোনালি; ভগবানগোলার তাজবানু, আমারোজা, বেহিলাবিবি সহ ১০ জন; হুড়শী লোচনপুরের শতাধিক পাচার হওয়া মেয়েদের মধ্যে উর্মিলা, মীরা, তর্জিনা, আদরা সহ প্রায় দশজন মেয়ে উদ্ধার হয়েছে। জলঙ্গি, লালবাগ, জিয়াগঞ্জ, লালগোলা, বহরমপুর থানা সংলগ্ন এলাকার আরও কিছু পাচার হওয়া কিশোরী উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মেয়েদের বেশিরভাগকেই ফেরানো সম্ভব হয়েছে জেলার মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে। অন্যেরা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তৎপরতায় উদ্ধার হয়েছে। অন্যান্য জেলার ঘটনাও প্রায় একই রকম। পাচার হওয়া মেয়েরা উদ্ধার হয়েছে কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, বিহার ও কলকাতার নিষিদ্ধপল্লী থেকে। পাচার হওয়া মহিলাদের সংখ্যা যা, তার তুলনায় উদ্ধারের সংখ্যা খুবই কম। মুর্শিদাবাদ কৃষিপ্রধান জেলা। প্রতি বছর বন্যা ও ভাঙনে লক্ষ লক্ষ মানুষ সর্বস্ব খুইয়ে ভিখারিতে পরিণত হচ্ছে। কর্মহীনতা বাড়ছে হু হু করে। আবার, চাষের খরচ বেড়ে যাওয়ায় গরিব চাষী জমি হারিয়ে খেতমজুরে পরিণত হচ্ছে। সমানে বেড়ে চলেছে উপার্জনহীন মানুষের সংখ্যা। এরই সুযোগ নিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দালালরা কর্মসংস্থানের লোভ দেখিয়ে কিশোরীদের পাচার করছে।

নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন ব্লকেও নারীপাচারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। নদীয়া জেলার নবদ্বীপের প্রাচীন মায়াপুর ও প্রতাপনগরের বিস্তীর্ণ কলোনি এলাকা থেকে এ বছরেই নিখোঁজ হয়েছে অসংখ্য কিশোরী। উদ্ধার হওয়া এক কিশোরীর মা জ্যোৎস্না দাস জানিয়েছেন, তাঁর মেয়ে সহ আরও অনেককে মাসে দু'হাজার টাকা বেতনের কাজের কথা বলে তাদের পাড়ার দুই যুবক দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে অন্ধকার জগতে পৌঁছে দিয়েছিল, (১৫ জুলাই ০৫, আনন্দবাজার পত্রিকা)। নবদ্বীপের প্রতি পাচারকারীদের আকর্ষণের কারণ কী? এখানে অর্থনীতির বুনিয়াদ ছিল তাঁতশিল্প। বর্তমানে তাঁতশিল্পের মৃতপ্রায় অবস্থা নবদ্বীপ তথা গোটা জেলার একটা বড় অংশের মানুষের অর্থনৈতিক অবলম্বন নষ্ট করে দিয়েছে। লক্ষাধিক তাঁতশিল্পী বর্তমানে বেকার, কর্মহীন। এদের মধ্যে অনেকেই দিনমজুর খাটে, রিক্সা টানে, ট্রেনে-বাসে পণ্য ফেরী করে, লটারির টিকিট বিক্রি করে। এদের বাড়ির অনেক মেয়েই লোকের বাড়িতে কাজ করে। এই অবস্থায় মেয়েরা কাজ পাওয়ার হাতছানিতে সাড়া দিয়ে দালালদের জালে পড়ে। এ জেলার হাঁসখালিতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে চূড়ান্ত দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে পাচারকারীরা কাজ হাসিল করছে। ১০ বছরের মেয়ে শেফালী পাহাড়ী ও ১২ বছরের মেয়ে টুম্পা পাহাড়ীকে, তাদের মায়েদের মাত্র ১০০ টাকা করে দিয়ে 'ভাল কাজ' দেবার নাম করে এক পাচারকারী নিয়ে যায়। গত মার্চ মাস থেকে তারা নিখোঁজ। উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়া, বসিরহাট, বনগাঁ এলাকা থেকেও অজস্র কিশোরী পাচার হয়েছে।

খোদ কলকাতাতেই নারীপাচার বেড়ে চলেছে। আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে পুনের নিষিদ্ধ পল্লী থেকে ৯টি মেয়ে উদ্ধার হয়েছে। এই মেয়েদের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বাঘাযতীনের দুই কিশোরীও আছে। ওরা এলাকায় পরিচারিকার কাজ করত। উদ্ধার হওয়া মেয়েদের ফিরে পেয়ে মা অঝোরে কাঁদে, কিন্তু বুঝতেই পারে না, যাদবপুর থেকে তার মেয়ে কেমন করে পুনেতে চলে গিয়েছিল। বাকি মেয়েরা দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোসাবা, বাসন্তী, মহেশতলা, বারুইপুর, উত্তর ২৪ পরগণার আমডাঙা এবং নদীয়ার চাপড়ার বাসিন্দা। জুলাই মাসের গোড়ার দিকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সাফাই কর্মী বি মূর্তির স্ত্রী মুন্নি একজন নারী পাচারকারী হিসাবে ধরা পড়ে। ''৪১ ইডেন হসপিটাল রোডে মেডিক্যালের গ্রুপ ডি আবাসন। আবাসিকদের অভিযোগ, আবাসনের একটি ঘরে স্বামী সন্তান নিয়ে সংসার করার ফাঁকে ফাঁকেই মেয়ে পাচারের ব্যবসা চালাত মুন্নি।'' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১-৭-০৫) দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সকল জেলা থেকেই বর্তমানে নারীপাচার শুরু হয়েছে।

পাচারের ঘটনায় আতঙ্কিত শুধুমাত্র দরিদ্র পরিবারগুলিই নয়, মধ্যবিত্ত পরিবারের অভিভাবকরাও। গত ১৬ জুলাই উত্তর ২৪ পরগণা জেলার গাইঘাটা থানার শিমূলপুর গ্রামের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী তুলি বিশ্বাসকে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে ডাউন বনগাঁ লোকালে অচেতন করে তুলে নিয়ে চম্পট দেওয়ার চেষ্টা হয়। পুলিশের ডি জি বলেন, ''মুক্তিপণ নয়, অসৎ উদ্দেশ্যে কাজে লাগানোর জন্য মেয়েটিকে অন্যত্র পাচার করার চেষ্টা হচ্ছিল।'' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯-৭-০৫)

রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর নাকি নারীপাচার নিয়ে উদ্বিগ্ন। নারীনির্যাতন রোধে সরকার রাজ্য মহিলা কমিশন গঠন করেছে। বর্তমানে নারীপাচার রুখতে জেলাওয়ারি কমিটি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সমাজকল্যাণ দপ্তর। রাজ্যে নারীনিগ্রহ ও নারীপাচারের ঘটনা বেড়েছে একথা স্বীকার করে মুখ্যমন্ত্রী ৩১ আগস্ট এই বিষয় নিয়ে কলকাতায় কর্মশালা করেছেন। নারীপাচার রোধে প্রচারমূলক কর্মসূচী, যেমন পথনাটিকা, দেওয়াল লিখন ইত্যাদি জেলাগুলিতে গ্রহণ করতে বলেছেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় নারী ও শিশুপাচার রোধে গত ১১ জুলাই রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান যশোধরা বাগচীর নেতৃত্বে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ কর্মশালায় জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, রাজ্য সি আই ডি'র প্রধান উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন মহিলা সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সি আই ডি'র ইন্সপেক্টর জেনারেল সেদিন বলেন, ''পুলিশের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, দেশের ৯০ শতাংশ পাচার হওয়া শিশু ও মহিলা এই জেলারই। ...পশ্চিমবঙ্গ থেকেই সবচেয়ে বেশি শিশু ও নারী পাচার হচ্ছে (বর্তমান, ১২-৭-০৫)। কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্যামসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, রাজ্য মহিলা কমিশনের ভারতী মুৎসুদ্দি, সর্বাণী ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, ''নারী ও শিশু পাচারকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রয়োজনীয় তৎপরতা দেখায় না। সেজন্য পাচারের ঘটনা ক্রমাগত বাড়লেও কোনও পাচারকারীর সাজা হচ্ছে না। তাতেই এই পাচার বাড়ছে।'' (বর্তমান, ১২-৭-০৫) একই অভিযোগ করেন মহিলা সংগঠনগুলি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মহিলা সংগঠন ছাড়াও জবালা, সুপ্রভা, পঞ্চশীলা, নারী উদ্যোগ সমিতি, সিনি'র মতো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মকর্তারাও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউই রাজ্য মহিলা কমিশনের ঐ কর্মশালা থেকে সমস্যার প্রতিকারের বা তার ব্যাপকতা লাঘব করার প্রশ্নে আশার কোন আলো পাননি।

২০০০ সালে 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকায় একটা ভয়াবহ ও মর্মান্তিক তথ্য প্রকাশিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একটি সমীক্ষা প্রকল্পে বিশিষ্ট একজন অধ্যাপক দেখান, ''ঐ বছরে ১৩-১৯ বছর বয়সী ২০,০০০ মেয়ে কলকাতায় দেহব্যবসায়ে লিপ্ত হয়েছে। তারা এসেছিল মুর্শিদাবাদ, বাংলাদেশ ও নেপাল থেকে। জবালা অ্যাকশান রিসার্চ অর্গানাইজেশনের একটি সমীক্ষাতে প্রকাশ পায় যে, ''দেহ ব্যবসায়ে যুক্ত মেয়েদের ৮০ শতাংশ এসেছে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে।'' একটু ভাত কাপড় ও আশ্রয়ের জন্য দেহ ব্যবসায়ে নিযুক্ত মা-বোনেদের সংখ্যা বর্তমানে ভারতবর্ষে ১ কোটির কাছাকাছি। অথচ স্বাধীনতা লাভের ৫৮তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের উৎসব সাড়ম্বরে হয়ে গেল এক মাস আগে!

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ''পশ্চিমবঙ্গ নারীপাচার চক্রের বড় কেন্দ্র। দেহব্যবসারও রমরমা চলছে এখানে। দারিদ্র্য ও অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে একাধিক আন্তর্জাতিক চক্র ও পুলিশের একাংশের মদতে এই রাজ্যে নারীপাচারের এক দালালচক্র কাজ করছে। মেয়ে পাচার করে রাজ্যে অধিকাংশ দালালই বছরে গড়পড়তা লাখখানেক টাকা রোজগার করছে। চাহিদা অনুযায়ী মেয়েদের দাম পাঁচ হাজার টাকা থেকে দশ হাজার টাকার মধ্যে ওঠানামা করে। কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া ও বেকারির কারণেই মেয়ে পাচার বাড়ছে। এদের মধ্যে নাবালিকাদেরই চাহিদা বেশি, ৬৮-৮ শতাংশই নাবালিকা। এই চাহিদার একটি বড় অংশ যায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে (বর্তমান ২৮-১০-০৪)।

বলা হয়েছে, নারী পাচার রুখতে সম্প্রতি রাজ্য সরকারের সমাজকল্যাণ দপ্তর কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই উদ্দেশ্যে তারা জেলাওয়ারি কমিটি গঠন করবে। জুলাই মাস থেকে রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে এই কমিটি গঠন করা হবে। এছাড়া প্রতিটি জেলায় জেলা কমিটি, মহকুমা কমিটি, ব্লক কমিটি ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কমিটি তৈরি হবে। ''জেলা কমিটিতে থাকবেন জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক। মহকুমা স্তরে মহকুমা শাসক, এস ডি পি ও, বি এস এফ। ব্লক কমিটিতে থাকবেন বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, স্থানীয় থানার ওসি। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে প্রধান সহ সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের সকল সদস্য, আই সি ডি এস এর কর্মী ও একজন পুলিশ অফিসার।'' (বর্তমান, ২৮-৬-০৫)

প্রশ্ন হচ্ছে, শুধুমাত্র কমিটি গঠন বা পথনাটিকা, দেওয়াল লিখনের মতো কর্মসূচি গ্রহণ করে কি নারীপাচার রোখা সম্ভব? ভাবা দরকার, পাচারকারীরা নারীপাচার করে কেন? নারীরাই বা পাচার হয় কেন? গোটা দেশজুড়ে জনজীবনে চলছে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে চরম আর্থিক অনিশ্চয়তা। শহরেই বেকারি কেবল বাড়ছে না, গ্রামেও সাধারণ মানুষের কাজ নেই; চাষের খরচ বাড়ছে কিন্তু ফসলের দাম নেই। অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাও এই রাজ্যে ঘটে চলেছে। প্রতি বছর খরা, বন্যা, নদীর ভাঙনে লক্ষ লক্ষ পরিবার সর্বস্ব খুইয়ে ভিখারিতে পরিণত হচ্ছে। সবহারানো উদ্বাস্তু মানুষদের জন্য রাজ্য সরকার কোন সাহায্য বা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে না। অভাবগ্রস্ত পরিবারের মেয়েরা শুধু নিজের একটু খাদ্য বা আশ্রয়ের জন্যই নয়, পরিবারকে বাঁচাতেও আয়ের সন্ধান করে। নারী পাচারকারীরা এই সুযোগ নেয়। দারিদ্র্য দূরীকরণ নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মন্ত্রীদের যত বক্তৃতা আছে, তার সামান্য অংশও যদি বাস্তবে থাকত, তবে দরিদ্র পরিবারগুলি সামান্য হলেও রিলিফ পেত। বন্ধ কারখানা খোলার পরিবর্তে বন্ধের সংখ্যাই বাড়ছে। ক্ষুদ্র শিল্প ধ্বংসের পথে। সরকার খালপাড়, রেলধার থেকে ঝুপড়ি উচ্ছেদ করে দিচ্ছে শহরকে সুন্দর করার জন্য, কিন্তু ভেবে দেখছে না যে, এর ফলে জীবিকাচ্যুত পরিবারগুলো খাবে কী, বাঁচবে কী করে! মেয়েদের যারা পাচার করে, এদের নিয়ে ব্যবসা করে, তাদের সাথে পুলিশের যেমন লেনদেন আছে, তেমনই শাসকদলের লাইসেন্স আছে তাদের পকেটে। ফলে তারা বেপরোয়া। পুলিশ সব জেনেও নিষ্ক্রিয় থাকে। অপর একটি দিকও ভেবে দেখার মতো। টিভি, সিনেমা, প্রচারমাধ্যমে কুরুচিপূর্ণ মূল্যবোধহীন যে সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার হচ্ছে, তার দ্বারা অধঃপতিত মানুষ প্রভাবিত হয়ে অর্থ রোজগারের জন্য নারীপাচারের মতো জঘন্য কাজে লিপ্ত হতেও দ্বিধা করছে না। অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষেও পর্যটন শিল্পের প্রসারের নামে সেক্স ট্যুরিজম বাড়ছে, সেজন্য দেশি-বিদেশি পুঁজি আবাহন করছে সরকার। পতিতালয়ের মেয়েদের 'যৌনকর্মী' বলে স্বীকৃতি দিয়ে রুচিহীন কাজের অপরাধবোধকেই নষ্ট করে দিচ্ছে একদল ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী ও ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক নেতারা।

এই মূল কারণগুলিতে হাত না দিয়ে, কিছু পথনাটিকা ও দেওয়াল লিখন করলে কি সমস্যার কেশাগ্রও স্পর্শ করা সম্ভব? ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি কাউন্সিলের সাম্প্রতিক সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হয়েছে, ''মহিলাদের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নতিসাধনে দেশের প্রধান রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ অনেক পিছিয়ে পড়েছে।''.... কেন্দ্রীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন গিরিজা ব্যাস বলেছেন, ''এ রাজ্যটা হয়ে দাঁড়িয়েছে নারীপাচার, নারীচালান এবং নারী নির্যাতনের রাজ্য। আন্তর্জাতিক নারী পাচারচক্র পশ্চিমবঙ্গকে ব্যবহার করছে ট্রানজিট (যাত্রাপথ) এবং ডেস্টিনেশন (গন্তব্য) হিসাবে।'' (বর্তমান, ৩-৭-০৫) সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের ২৮ বছর শাসনের পর এই চিত্র কি সমস্যা সমাধানে তাদের আন্তরিকতা ও দায়বদ্ধতার পরিচয় দেয়?

নারীপাচার রোধের কমিটিতে পুলিশ-প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের রাখার কথা বলা হয়েছে, অথচ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্ট বলছে, ''নারী পাচারকারীদের সঙ্গে পুলিশের একাংশের যোগসাজসেই পাচার চলে।'' সি আই ডি'র কর্তারা কি এই খবর রাখেন না? একজন

ছয়ের পাতায় দেখুন

কৃষকদের ঠকাতেই শিল্পায়নের অজুহাত

একের পাতার পর

গেছে এবং উচ্ছেদের অপেক্ষায় যারা দিন গুণছে তাদের কী হবে? কোথায় থাকবে? কীভাবে দিন চলবে? প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএমের নেতা জ্যোতি বসু বলেছেন, ''কৃষকদের বোঝাতে হবে, কৃষকের ছেলে চিরকাল কৃষক থাকবে না।'' (সংবাদ প্রতিদিন ১০-৯-০৫)। বেশ ভাল কথা, তাহলে তারা কী হবে? গত কয়েক বছরে জমি হারা লক্ষ লক্ষ কৃষক কী হয়েছে? গ্রামীণ মজুর হয়েছে। গ্রামে কাজ না পেয়ে শহরে এসেছে। এখানেও এত কাজ কোথায়? অনেকেই হয় দিনমজুরি, না হয় ভিক্ষা করছে, আশ্রয় নিয়েছে হয় ফুটপাতে না হয় নর্দমার ধারের ঝুপড়িতে। ফলে, জ্যোতিবাবুর উপদেশের বাস্তব রূপ দেখার জন্য ভবিষ্যতের দরকার নেই, এখনই তা প্রকটভাবে দৃশ্যমান। লক্ষ লক্ষ কৃষকের ছেলে আর কৃষক নেই, তারা সর্বহারায় পরিণত। জ্যোতিবাবু আরও বলেছেন ''চার-পাঁচ বছরের মধ্যে রাজ্যকে শিল্পক্ষেত্রে উঠে আসতেই হবে।'' জ্যোতিবাবু স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ২৪ বছর। দেশীয় শিল্পপতিদের তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি বলেই সুবিদিত। তিনি পুঁজি আনার জন্য প্রায় প্রতিবছর বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। গত ৪ বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে সিপিএম শুধু দেশীয় নয়, বিদেশি শিল্পপতি ও সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বস্ত দল বলে প্রমাণ করেছে, তবুও 'শিল্পায়ন' হয়নি কেন? আর ২৮ বছরে যা হয়নি, আগামী ৪ বছরে তা হয়ে যাবে — একথা ভাবার বাস্তব কারণ কী?

সি পি এম রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস আশ্বাস দিয়েছেন যে, কারও জমি বিনে পয়সায় সরকার নেবে না, ''যেটুকু জমি নেওয়া হবে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। অনুর্বর ও একফসলি জমির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মালিককে ক্ষতিপূরণের টাকার অর্ধেক দেওয়া হবে। যদি দুই বা তিন ফসলি জমি নিতেই হয় সেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের টাকা, বিকল্প বাসস্থান, ও চাকরি দেওয়া হবে'' (সংবাদ প্রতিদিন, ১০-৯-০৫)। অর্থাৎ তিনি বললেন, যাদের বাস্তুজমি ও একফসলি জমি নেওয়া হবে — তাদের বিকল্প বাসস্থান দেওয়া হবে না, তারা পথে পথে ঘুরে বেড়াবে, ক্ষতিপূরণের যে সরকারি রেট তারও মাত্র অর্ধেক তাদের দেওয়া হবে, সেটা ভেঙে তারা খাবে, আর সেটা ফুরিয়ে গেলেই তারা যেভাবে হোক বাঁচবার চেষ্টা করবে, নয়ত অনাহারে মরবে — তাতে তাঁর সরকারের কোন দায়দায়িত্ব থাকছে না। তবে দুফসলি বা তিনফসলি জমির মালিকদের ক্ষেত্রে চাকরির ব্যবস্থা করবে সরকার। কিন্তু চাকরি কোথায়? শ্রমিকরাই যখন কাজ হারিয়ে বেকারে পরিণত হচ্ছে সেখানে জমি থেকে উৎখাত হওয়া কৃষক কোথায় কাজ পাবে? কৃষককে জমি থেকে মুক্ত করে শহরের শ্রমিকে রূপান্তরিত করার পুঁজিবাদী শিল্পায়নের ধ্রুপদী যুগ সেই কবেই অস্তাচলে গেছে। এখন জমিহারা কৃষকের বিকল্প কাজ বলতে কী বোঝায়? সেটাই আমাদের শুনিয়েছেন রাজ্যের ভূমিসংস্কারমন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা। তিনি বলেছেন, 'যাঁদের জমি নেওয়া হবে তাঁদের জন্য এই উপনগরীতে কাজের সুযোগ করে দেওয়া দরকার। যারা উপনগরীর বাসিন্দা হবেন, তাঁদের বাড়িতে কাজের লোক দরকার; ধোপা, নাপিত, সব্জি বিক্রেতা, চৌকিদার, মালি, রক্ষণাবেক্ষণ এইসব কাজে জমি হারানো চাষীরা ও তাদের পরিবার রোজগারের সুযোগ পেয়ে যাবেন।' চমৎকার! ছিলেন দুই/তিন ফসলি জমির মালিক কৃষক, হয়ে যাবেন বাড়ির কাজের লোক, মালি, চৌকিদার। মন্ত্রীরা আরও বলেছেন, নগরায়নের সুযোগে বিপুল সংখ্যক নির্মাণশ্রমিকের দরকার হবে। সেখানে জমি থেকে উৎখাত হওয়া চাষীরা কাজ করতে পারবে। কথাটা ঠিক। তবে অর্থ দাঁড়ায় এই যে, চাষী তার স্বাধীন পেশা থেকে উৎখাত হয়ে, বর্গাদার তার চাষের জমি হারিয়ে খেতমজুরের হাত ধরে নির্মাণ-শ্রমিকের লাইনে গিয়ে দাঁড়াবে। এর নাম যদি উন্নয়ন হয় তবে সেই উন্নয়ন প্রক্রিয়া সারা দেশের সঙ্গে এ রাজ্যেও বহুপূর্ব থেকেই চলছে। ১৯৯১ থেকে ২০০১ — এই দশ বছরে সরকারি হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে জমি হারিয়ে ২৪ লক্ষ নতুন ভূমিহীন খেতমজুর সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের নতুন উন্নয়নের ধাক্কায় আরও অসংখ্য চাষী ভূমিহীন হবে, খেতমজুররাও খেতের কাজের সুযোগ হারাবে এবং সবাই মিলে নির্মাণ-শ্রমিকের ভিড় বাড়াবে। নির্মাণ-শ্রমিক আরও কম মজুরিতে সহজলভ্য হবে। শ্রমিক-ঠিকাদার ও প্রমোটাররা বিপুল মুনাফা লুটবে। কী চমৎকার উন্নয়ন! চাষীর বুকের রক্তের বিনিময়ে, নির্মাণ-শ্রমিকদের সস্তায় খাটুনির মূল্যে যে নগরায়ন হবে — সেই নগরে কিন্তু এই চাষী ও শ্রমিকদের ঠাঁই হবে না; সেখানে আসর জাঁকিয়ে বসবে উচ্চকোটির মানুষ; সেখানকার হোটেল-বার-রেস্তোরাঁ-শপিং মলে থাকবে তাদের স্ফূর্তির আয়োজন। এখন শিল্প মানেই তো এই আবাসন, হোটেল এবং তথ্যপ্রযুক্তি — যেখানে কর্মসংস্থানের তেমন সুযোগই নেই। এই উন্নয়ন ঘটাতেই বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও জ্যোতিবাবুর মতো সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়ায় ছুটে গেলেন এক ঝাঁক দেশীয় শিল্পপতিকে সঙ্গে নিয়ে, জনসাধারণের ট্যাক্সের টাকা ব্যয় করে। ইন্দোনেশিয়ার সালিম গোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি চুক্তি করে এলেন। এই সালিম গোষ্ঠী সে দেশের লক্ষ লক্ষ কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীর হত্যাকারী স্বৈরাচারী সুহার্তোর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে দেশের আইনকানুনকে দুপায়ে মাড়িয়ে এই দুয়ের যুগলবন্দী বিপুল মুনাফা কামিয়েছে। সুহার্তো জমানার শেষে এই সালিমদের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার জনরোষ ফেটে পড়ে। সালিমের বাড়ি ও ব্যাঙ্ক ভাঙচুর হয়েছে, তার বিখ্যাত লুণ্ঠনক্ষেত্র ময়দাকলের একচেটিয়া কারবার বন্ধ হয়ে গেছে। তার 'ব্যাঙ্ক সেন্ট্রাল এশিয়া' চলে গেছে সরকারের ব্যাঙ্ক পুনর্গঠন এজেন্সির হাতে। তার নিয়ন্ত্রণাধীন সুপার মার্কেটে দুদিন ধরে লুঠপাঠ চলেছে। তারপর তা ছড়িয়ে পড়েছে বান্দুং ও সুরাবায়। ত্রিশক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশাল ছাত্র মিছিল বেরিয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। সুহার্তো-সালিম — এই যুগলবন্দীর বিশাল লুণ্ঠন সাম্রাজ্যে গণআক্রোশ আছড়ে পড়েছে। সালিমদের হাতে ছিল পাম তেলের গাছ চাষের জন্য ২ লক্ষ ৬৫ হাজার ৭৭৭ হেক্টর জমি, যাকে বলা হয় সালিমদের পাম-সাম্রাজ্য। চাষীদের থেকে এই জমি নেওয়ার সময় সালিম গোষ্ঠী কথা দিয়েছিল, বাগানের ৭০ ভাগ জমি চাষীদের হাতে দেওয়া হবে চাষের জন্য। কিন্তু দেওয়া হয় মাত্র ১০ ভাগ। সুহার্তো সরকারের মদতে সালিমরা চাষীদের এইভাবে ঠকিয়ে বিপুল জমি দখল করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, পুঁজির কোনও রঙ নেই। তিনি কিন্তু একথা বলেননি যে, পুঁজিমাত্রই শোষণমূলক। আসলে পুঁজির এই চরিত্রকেই তো তিনি লুকোতে চেয়েছেন। আবার, পুঁজির রঙ নেই, একথাটা বলার দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের জনগণের দীর্ঘ লড়াইকে তিনি নস্যাৎ করে দিয়েছেন এবং নিজেকে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির তল্পিবাহক বলে প্রমাণ করেছেন।

সালিমদের সাথে তাদের অদ্ভুত মিল। সালিমের মত তাঁর সরকারও চাষীদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঠকায়, বঞ্চিত করে, পথের ভিখিরি বানায়। যে সরকার শিক্ষকদের অবসরকালীন প্রাপ্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও পেনশন দেয় না, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের একাংশ সরকারি দপ্তরে দরবার করতে করতেই মারা যান, তাঁদের স্ত্রীদের আদালতের স্মরণ নিয়ে তবে টাকা আদায় করতে হয়, সেই সরকার যখন চাষীদের জমির ক্ষতিপূরণ ও চাকরি দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় তখন তা যে কত অসার তা রাজ্যবাসীর বুঝতে অসুবিধা হয় না। যেমন বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ১৯৮৯ সালে বীরভূমের চিনপাই থানার বেশ কিছু গ্রামের ধানজমি দখল করেছিল রাজ্য সরকার। গোপালপুর সমেত দুটি গ্রাম তুলে দিয়ে সেখানে 'নীল নির্জন' নামে দুটি জলাধার তৈরি হয়। জমি যায় ৬৪০ জন চাষীর। শর্ত ছিল — খোয়া যাওয়া জমির মালিকদের চাকরি দেওয়া হবে। তৎকালীন বিদ্যুৎমন্ত্রী শঙ্কর সেন তো বটেই, বর্তমান বিদ্যুৎমন্ত্রী মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ঐ প্রতিশ্রুতি দেন। গত ১৬ বছরে চাকরি হয়েছে মোট ৪৫ জনের। (প্রতিদিন - ৮-৯-০৫) বাস্তু ও চাষের জমি হারানো অন্য চাষীরা ঠিকাশ্রমিকের কাজ করে কোনরকমে বেঁচে আছে। জ্যোতিবাবুর কথাই ঠিক! কৃষকরা আর কৃষক থাকছে না!

রাজারহাটে 'নিউ টাউন' উপনগরী গড়ে উঠলে সেখানে জমিহারা প্রতি পরিবারের একজনকে চাকরি দেবার প্রতিশ্রুতি বারবার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, কৃষিজমিচ্যুত প্রায় ২৬ হাজার কৃষক ও হাজার হাজার ভূমিহীন কৃষিমজুর এবং সেই সঙ্গে কয়েক হাজার বর্গাদারের একজনও কোন কাজ পায়নি। অথচ সরকারি জমির সওদাগর 'হিডকো' গিলে খেয়েছে হাজার হাজার বিঘা উর্বর কৃষি জমি, পুকুর, বাস্তু ভিটে — সব কিছু। আর তারপর ভূমিহারা মানুষগুলো সরকারের দরজায় রোজ হত্যে দিচ্ছে জমির দামটুকু পাওয়ার জন্য। দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকার প্রতিবেদক সুকুমার মিত্র সরেজমিনে ঘুরে এসে লিখেছেন, ''বালিগুড়ি গ্রামের সাতশো কৃষক পরিবারের কয়েকশো বিঘা সরষের খেতে রাজ্য সরকারের পুলিশবাহিনী সি পি এমের ক্যাডারদের সঙ্গে নিয়ে কয়েক কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি করলেও নামমাত্র টাকা দিয়ে কৃষকদের সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে বলে জানাচ্ছেন অলিমুদ্দিন মোল্লা। তাঁর অভিযোগ, ১ লক্ষ টাকার সরষে ক্ষতি করে কৃষককে দেওয়া হয়েছে মাত্র ১০ হাজার টাকা যা কি না কৃষকের চাষের খরচ থেকেও কম। এসব নিয়ে সি পি এমের কৃষক সভা তো নয়ই এমনকি তৃণমূল কংগ্রেস বা কংগ্রেস কেউ তাঁদের পাশে দাঁড়ায়নি বলে অভিযোগ বালিগুড়ির আনসার আলি ফকির, মহম্মদ লস্কর, মামুদ আলি মোল্লাদের। ফসল ক্ষতি করে জমির দখল নিলেও বালিগুড়ির আসরাত, জিন্নাত, হাসেমরা কেউ কোনও ক্ষতিপূরণ পাননি।

ফসলের ক্ষতিপূরণ তো দূরের কথা, বামফ্রন্ট সরকার ঘটা করে একদিন যেসমস্ত ভূমিহীনদের পাট্টা বিলি করেছিল, রাজারহাটে সেই জমি হারানো পাট্টাদারদের এক বড় অংশ আজও জমির ক্ষতিপূরণ পাননি। চক পাচুড়িয়ার তিন পাট্টাদার জুব্বার মোল্লা, গুলান মোল্লা, জলিল মোল্লা জমির ক্ষতিপূরণ না পেয়ে অকালে দুঃখে কষ্টে প্রাণ হারিয়েছেন। অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটছে এসব গরিব পাট্টাপ্রাপ্ত পরিবারের সদস্যদের। জুব্বার মোল্লার ছেলে রাজ্জাক মোল্লা পাগল হয়ে আজ ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে পথে পথে।''

সুকুমারবাবু লেখেন, ''অনেক গালভরা কথা সেদিনও বলা হয়েছিল, নগরায়ন হলে মানুষের কাজ বাড়বে, বদলে যাবে গোটা চেহারাটা। হ্যাঁ, সত্যিই বদলে গেছে রাজারহাট। যা খগেন মণ্ডল, সরলাবালা, হবিবুর, রসুল, মনসুর, ফকির ইউনুসদের না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। বদলটা এরকমই।'' 'শিল্পের জন্য জমি চাই, জমি চাই' এই সরকারি প্রচারে যাঁরা গলা মেলাচ্ছেন, তাঁরা এই বঞ্চিত সর্বস্ব হারানো চাষীদের কী জবাব দেবেন? অধ্যাপক শুভেন্দু মজুমদার (বর্তমান ১৮-৯-০৫) সম্প্রতি এক নিবন্ধে এঁদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন তুলেছেন, ''সালিম মডেলের উন্নয়নে যাঁদের স্থির বিশ্বাস, তাঁদের বলি, আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনার বসতবাড়িটি যদি যেকোনও মূল্যে সরকার অধিগ্রহণ করে সেই জায়গায় সালিমকে প্রাসাদোপম হাউজিং কমপ্লেক্স গড়বার অনুমতি দেয় — যার ছায়ায় বসবাস করবার আর্থিক সংস্থানটুকু আপনার নেই — তবে সেই উন্নয়নের গুণগানে আপনি মুখরিত হবেন কি?''

সি পি এম নেতারা সাফাই দিতে বলছেন, এখন তো চাষের খরচ চালাতে না পেরে চাষীরাই জমি বিক্রি করে দিচ্ছে; তাহলে সরকার সেই জমি নিলে ক্ষতি কী? প্রথম প্রশ্ন, এতদিন ধরে ভূমিসংস্কার নিয়ে এত সাফল্যের প্রচার যে চালানো হল, এটাই কি তাহলে তার পরিণাম? দ্বিতীয় প্রশ্ন, চাষীর রক্ষাকর্তা বলে নিজেদের দাবি করে, আজ চাষীর সংকটের সুযোগ নিয়ে সেই চাষীকে জমি বিক্রিতে বাধ্য করার সরকারি ভূমিকাকে কী বলা হবে? তৃতীয় প্রশ্ন, চাষী নিজের ইচ্ছায় জমি বিক্রি করলে, দাম নিয়ে তার রাজি না হওয়ার যে অধিকার থাকে, এখানে সরকার তা দিচ্ছে না কেন? এই পরিস্থিতি বোঝাতে প্রমোটার মস্তান চক্রের উপমাই উঠে আসছে। প্রমোটার সালিমদের জন্য জমি জোগাড় করে দিতে সরকার মস্তান হয়ে মাঠে নেমেছে। ভয় দেখিয়ে, প্রয়োজনে পুলিশ ও ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী নামিয়ে চাষীদের সরকার নির্ধারিত দামে জমি দিতে বাধ্য করবে। সরকারের স্বার্থ কী? ধরা যাক, চাষীদের কাছ থেকে কাঠাপ্রতি ১০ হাজার টাকায় কিনে সরকার তা সালিমদের বেচবে কম করে ৩ লাখ টাকা কাঠা দামে। সালিম আবার উপনগরী বানিয়ে বেচবে বহুগুণ বেশি দামে। মুনাফা করবে প্রচুর। লাভ সরকারের, লাভ সালিমের। আর চাষীরা ঠকবে, মরবে।

সিপিএমের বহু কর্মী মনে করছেন, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জন্যই এইসব হচ্ছে। তা কিন্তু নয়। হঠাৎ করে সি পি এম এই নীতি নিয়েছে একথা ভাবলে ভুল হবে। ১৯৯৭ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছিলেন — 'মুক্ত অর্থনীতির ফলে কৃষিকাজে পুঁজি বিনিয়োগের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। তাই পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইনের সংশোধনী দরকার' (আনন্দবাজার ১১.৫.৯৭)। এই সংশোধনী জ্যোতিবাবুরা অবশ্য আগেই শুরু করেছিলেন। ১৯৯৬ সালে ভূমিসংস্কার আইনের ১৪ (জেড) ধারার সংশোধন করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল — রবার ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমি জোগাড় করা। এরপর আবার সংশোধন করা হয় ২০০০ সালে। সংশোধনীতে বলা হয় — 'বর্গাদার রয়েছে এমন জমিতেও যাতে শিল্পস্থাপন ত্বরান্বিত করা যায়, এ জন্য পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইনের সংশোধন করা হল।' অর্থাৎ শিল্পস্থাপনের নামে পাকাপাকিভাবে বর্গাদার উচ্ছেদের ব্যবস্থা তখনই করা হয়েছিল। কিন্তু যত দিন গিয়েছে তত সি পি এম ও দেশি-বিদেশি শিল্পপতি পুঁজিপতিদের মৈত্রী আরও দৃঢ় হয়েছে। এইসব পুঁজির মালিকেরা দাবি তুলছে — 'জমি চাই, আরও জমি চাই'; 'প্রয়োজন মতো সুবিধাজনক জায়গায় আরও জমি দিতে হবে।' আর আইন? ফুঃ! আইন পাল্টাও, প্রয়োজনে আইন তৈরি করো, ভূমিসংস্কার আইন পাল্টে যুগোপযোগী করে নাও। পুঁজিপতিদের বাধ্য সন্তান ও সেবাদাস সি পি এম ফ্রন্ট সরকার এই কাজেই এখন মনোনিবেশ করেছে।

'শিল্পায়ন' নিয়ে সরকারি প্রচারে বারবার ঠকতে ঠকতে এবার একটা গুরুতর প্রশ্ন জনগণের মধ্য থেকেই উঠেছে। তাহল, শিল্প গড়াই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অসংখ্য বন্ধ কারখানার প্রায় ৪০ হাজার একর জমি খালি পড়ে আছে, সরকার শিল্প গড়ার জন্য সেই জমি নিচ্ছেনা কেন ? জবাবে সরকার বলছে, বন্ধ কারখানার জমির মালিকানা রয়েছে কারখানা মালিকদের হাতে, সরকারের হাতে নয়। চাষীর জমির মালিকানাও তো সরকারের নয় ! তাহলে সরকার কৃষিজমি অধিগ্রহণ করছে কী করে ?

ছয়ের পাতায় দেখুন

আন্দোলনের লক্ষ্যে জেলায় জেলায় মহিলা সম্মেলন

জলপাইগুড়ি

১০-১১ সেপ্টেম্বর অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের ৪র্থ জলপাইগুড়ি জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড হাসি হোড়, রাজ্য সভানেত্রী কমরেড সাধনা চৌধুরী এবং জেলা সভানেত্রী কমরেড উমা রায়। কমরেড হাসি হোড় প্রকাশ্য সমাবেশে শিক্ষা, সংস্কৃতি, বেকারি, নারী নির্যাতন ইত্যাদি সঙ্কটের বিষয়ে আলোচনা করেন। কমরেড সাধনা চৌধুরী নারীজীবনের সমস্যাগুলির উৎস সম্পর্কে বলেন এবং তার সমাধানের আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। কমরেড উমা রায় নতুন কমিটির সভানেত্রী হিসাবে এবং কমরেড শীলা বোস সম্পাদিকা হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন।

ব্যারাকপুর মহকুমা

২৭ আগস্ট উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ভাটপাড়া মডেল গার্লস হাইস্কুলে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের ৩য় ব্যারাকপুর মহকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নারী নির্যাতন, নারীপাচার, ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি, মাদক দ্রব্যের ঢালাও লাইসেন্স প্রভৃতির বিরুদ্ধে সম্মেলনে মূল প্রস্তাব গৃহীত হয়। এছাড়া ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে অসংখ্য বন্ধ কলকারখানা খোলার দাবিতে ও স্কুলে যৌনশিক্ষা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

প্রধান বক্তা এ আই এম এস এস-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড কৃষ্ণা সেন বলেন যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নারীরা পুঁজিতান্ত্রিক ও পুরুষতান্ত্রিক শোষণ-নিপীড়নের শিকার। এর থেকে মুক্তি লাভ করতে হলে সমানাধিকারের দাবির সঙ্গে সঙ্গেই পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার বিপ্লবী সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ। সম্মেলন পরিচালনা করেন উত্তর ২৪ পরগণা জেলা এম এস এস-এর সভানেত্রী কমরেড ইন্দ্রানী হালদার। কমরেড সুজাতা রায়কে সভানেত্রী ও কমরেড রত্না দত্তকে সম্পাদিকা করে পঁচিশ জনের নতুন মহকুমা কমিটি গঠিত হয়।

১১ সেপ্টেম্বর এম এস এস-এর ৪র্থ জলপাইগুড়ি জেলা সম্মেলনের প্রতিনিধি অধিবেশন

পশ্চিমবঙ্গ এখন নারীপাচারে শীর্ষস্থানে

চারের পাতার পর

দোষী পুলিশকেও কি তাঁরা ধরেছেন? শাস্তি দিয়েছেন? ঐ কমিটিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা থাকবেন বলা হয়েছে। কিন্তু শাসকদল ও শাসনক্ষমতার অলিন্দে যারা ঘোরাফেরা করে, সে কেন্দ্র বা রাজ্য যে স্তরেই হোক, নির্বাচনে ভোট কব্জা করার জন্য তারা ক্রিমিনাল ও মাফিয়াদের পোষে, বেআইনি অস্ত্র ব্যবসায়ীদেরও পোষে। এই প্রক্রিয়াতেই দেখা যাচ্ছে ক্রিমিনালরা কায়েমী স্বার্থের দলগুলির সেবা করতে করতে নিজেরাই রাজনৈতিক নেতা হয়ে গিয়েছে। পুলিশ-প্রশাসনের একটা বড় অংশই এই রাজনৈতিক নেতাদের ও দলগুলির পোষা চাকরের মত কাজ করে। শাসকদল, পুলিশ ও ক্রিমিনালদের এই চক্র ভোটের সময় শাসকদলকে সার্ভিস দেওয়ার বিনিময়ে, বাকি সময় যাবতীয় অসামাজিক কাজ বিনা বাধায় করে যায়, যার মধ্যে নারীপাচারের মত কাজও আছে। পুলিশ সব জেনেও নিষ্ক্রিয় থাকে। সুতরাং রাজ্য বা জেলাভিত্তিক কর্মশালা ও কিছু কমিটি করার দ্বারাই সরকার যদি তার আন্তরিকতা বোঝাতে চায়, তবে তাতে আস্থা রাখা কঠিন। একথা ঠিক যে, ভারতবর্ষে যে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাটি কায়েম হয়ে আছে, সেই পুঁজিবাদ কেবল বেকারি ও দারিদ্র্যই সৃষ্টি করছে না, তার থেকেও বড় সর্বনাশ ঘটাচ্ছে নৈতিকতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। এই দুইয়ে মিলে দেশের পরিস্থিতি আজ সত্যই ভয়ানক। কিন্তু জনগণের ভোটে নির্বাচিত বলে দাবি করে যে সরকার, তারা ভোটের সময় তো জনগণকে একথা বলেনি যে, সরকারে বসে তারা পুঁজিবাদের সেবা করবে! তাহলে জনগণের প্রতি তাদের দায় ও কর্তব্য আছে! সমস্যার সবটা না হোক, কিছুটা সরকার রোধ করতে পারে। নারী পাচারের ব্যবসা একদিনেই এমন ভয়াবহ আকার নেয়নি। এটাও ঘটনা নয় যে, সরকারের দৃষ্টি কেউ আকর্ষণ করার চেষ্টা করেনি। নানা জেলায়, বিশেষত মুর্শিদাবাদ জেলায় এ নিয়ে ধারাবাহিক আন্দোলন করেছে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন। সরকারি কর্তারা তাতে কান দেননি, পুলিশ সক্রিয় হয়নি। সরকার যদি সত্যই আন্তরিক হয়, তবে দুটি কাজ অবিলম্বে তাকে করতে হবে — প্রথমত দারিদ্র্যপীড়িত, বিশেষ করে ভাঙনে সর্বস্বান্ত পরিবারগুলিকে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, নারী পাচারকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। সর্বোপরি, এইসব ক্রিমিনালদের আশ্রয় ও মদত দেওয়া থেকে শাসকদল ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে বিরত হতে হবে। যে পশ্চিমবঙ্গ একদা শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে দেশে শীর্ষস্থানে ছিল, আজ সেই রাজ্য সব বিষয়ে পিছিয়ে পড়ে নারী পাচারে যদি শীর্ষে যায় তবে ২৮ বছরের সিপিএম শাসন কাকে দায়ী করবে? কোন্ অজুহাতে এই লজ্জা তারা ঢাকবে?

কৃষিতে বর্ধিত বিদ্যুত মাশুল

রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবি

কৃষি বিদ্যুতের মাশুল ১০০ শতাংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে, তার ফলে রাজ্যের ১০ লক্ষাধিক কৃষক পরিবার এক শ্বাসরোধকারী অবস্থার সম্মুখীন। অবিলম্বে এই বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার না করা হলে আগামী বোরো চাষের সময় অন্ধ্রপ্রদেশের মতো পশ্চিমবঙ্গের চাষীরাও আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবে।

অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাসের নেতৃত্বে ৫ জনের এক প্রতিনিধি দল ১৪ সেপ্টেম্বর রাজ্যপালের সাথে দেখা করে এক স্মারকলিপি দিয়ে তাঁকে সমস্যা সমাধানের জন্য হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছে।

প্রতিনিধিরা স্মারকলিপিতে জানিয়েছেন, যেখানে ভারতবর্ষের বেশিরভাগ রাজ্যে কৃষিতে ৫০ পয়সা ইউনিটে বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের দিতে হচ্ছে ৩·৫০ টাকা করে। বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বলা সত্ত্বেও কৃষিতে মিটার দেওয়া হচ্ছে না, কিন্তু কৃষকরা মিটার নিচ্ছে না বলে মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করার আবেদন জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। তাই কৃষকরা গত জুলাই মাস থেকে বাধ্য হয়ে বিল না দিয়ে ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে।

রাজ্যপাল দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রতিনিধিদের বক্তব্য শুনে বলেন, বিষয়টা যেহেতু রাজ্য সরকারের, তাই তাঁর পক্ষে এখনই কিছু প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয়, তবে তিনি বিষয়টি সম্পর্কে রাজ্য সরকারের কাছে খোঁজ নেবেন এবং আলোচনা করার জন্য বলবেন।

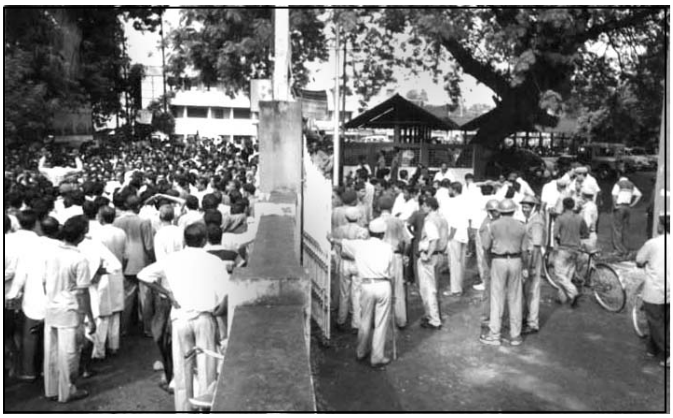

২২ সেপ্টেম্বর কৃষ্ণনগরে জেলাশাসক দপ্তরের সামনে বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুলের প্রতিবাদে কৃষকদের বিক্ষোভ

ভাদুয়ায় যুব সম্মেলন

৪ সেপ্টেম্বর হুগলি জেলার ভাদুয়ায় এ আই ডি ওয়াই ও'র আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন রাজ্য সভাপতি কমরেড সুরথ সরকার, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সুশান্ত পাল, এবং জেলা ইনচার্জ কমরেড চৈতালী ভট্টাচার্য। বক্তারা বেকারত্ব সহ যুবজীবনের সমস্যা সমাধানে বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা উচ্ছেদের আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। কমরেড বিকাশ ঘোষকে সম্পাদক এবং কমরেড ভাস্কর চাঁইকে সভাপতি করে আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়।

কৃষকদের ঠকাতেই শিল্পায়নের অজুহাত

চারের পাতার পর

আসলে, কারখানা বন্ধ করে দিয়ে শিল্পমালিকরা এখন সেই জমিতে আবাসনের ব্যবসায় নেমেছে, এই ব্যবসায় এখন প্রচুর মুনাফা, ঝুঁকি নেই বললেই চলে। এই যে নানা অজুহাতে কারখানা তুলে দিয়ে মালিকরা আবাসন ব্যবসায় পুঁজি ঢালছে, এমনকী বিদেশি পুঁজিও আসতে চাইছে আবাসনে, এই ঘটনা আজকের দিনের পুঁজিবাদী শিল্পসঙ্কট ও পুঁজির বর্তমান প্রবণতাকেই বুঝিয়ে দেয়। দেশে গরিবি যত বাড়ছে, বেশি বেশি সংখ্যায় মানুষের ক্রয়ক্ষমতা যত কমছে, পুঁজিপতিদের পণ্য বিক্রির বাজারও তত কমছে, তার বাজার সঙ্কট বাড়ছে, পুঁজি অলস হয়ে পড়ছে। ভারতের ব্যাঙ্কগুলিতে এখন আমানতের পরিমাণ বিরাট। শিল্পের জন্য ঋণের চাহিদা নেই। ক্রমাগত সুদ কমিয়েও ঋণ বাড়ানো যাচ্ছে না। ব্যাঙ্ক তাই এখন জমি-বাড়ি তৈরি ও কেনা-বেচার ঋণ দিচ্ছে দেদার। পুঁজি এখন উচ্চ মুনাফার জন্য খাটছে শেয়ারবাজারের ফাটকায়, আবাসন বা নগরায়নে (রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়)। কিছু যাচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তিতে, যেটা আবার দাঁড়িয়ে আছে সস্তা শ্রমে নানা বিদেশি কোম্পানির কাজ করে দেওয়ার উপর। নতুন নতুন শিল্প, কলকারখানা গড়ার জন্য পুঁজি বিনিয়োগ অতি সামান্য। এর ফলে যতটুকু কর্মসংস্থান হচ্ছে, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি শ্রমিক-কর্মচারী কাজ হারাচ্ছে কারখানা বন্ধ হওয়ার জন্য, চালু কারখানায় ছাঁটাইয়ের জন্য। এই ঘটনা প্রমাণ করে, আজকের দিনে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শিল্পের বিকাশ আর ঘটতে পারে না, বরং পুঁজিবাদই আজ ক্রমাগত শিল্পসঙ্কট ডেকে আনবে।

এই অবস্থায় যেসব রাজনৈতিক দল ও নেতারা 'শিল্প হচ্ছে', 'শিল্প হচ্ছে' বলে আওয়াজ তুলবে ও তুলছে, তারা হয় অজ্ঞ, না হয় ঠগবাজ। জনগণকে ঠকিয়ে গদির রাজনীতি করাই তাদের পেশা। তাই লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, সরকার 'শিল্প', 'শিল্প' করে প্রচার করছে, অথচ যদি প্রশ্ন করা যায়, কোন্ শিল্প হবে, তার জন্য কত জমি দরকার, কোথায় কোন্ জমি তারা নেবে, এজন্য কত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে ইত্যাদি সম্পর্কে সরকারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা কী, তার জবাব পাওয়া যাবে না। কারণ, এসব কিছুই সরকারের নেই। সরকার এখন শুধু দেশি-বিদেশি প্রমোটারদের কাছে কৃষকের জমি বেচে টাকা কামাতে চায়।

এই অবস্থা বুঝে নিয়েই গ্রামে গ্রামে চাষীদের বাঁচার জন্য জমি রক্ষার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতিতে জেলায় জেলায় শ্রমিক সম্মেলন

বর্ধমান ঃ পুঁজিবাদের সঙ্কট যত তীব্র হচ্ছে, শ্রমিকশ্রেণীর উপর মালিকদের আক্রমণও বাড়ছে, যার ফলে শ্রমিকরা তাদের বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত অধিকার ও সুবিধাগুলি হারাচ্ছে, তাদের চাকরির কোন নিরাপত্তাই থাকছে না। সরকারি-বেসরকারি সমস্ত ক্ষেত্রে কাজের বোঝা বাড়ছে, কমছে মজুরি। এই অবস্থায় যখন প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলা তখন তথাকথিত বৃহৎ বাম ট্রেড ইউনিয়ন সি আই টি ইউ, এ আই টি ইউ সি এবং দক্ষিণপন্থী আই এন টি ইউ সি, বি এম এস, এইচ এম এস প্রভৃতি ট্রেড ইউনিয়নগুলি দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষায় ঐক্যবদ্ধ ধারাবাহিক শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সুকৌশলে এবং কোথাও কোথাও সরাসরি বাধার সৃষ্টি করছে, যার ফলে শ্রমিকশ্রেণী মালিকী আক্রমণের সামনে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করছে অথবা দিশাহীন বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে — ১১ সেপ্টেম্বর রূপনারায়ণপুর নান্দনিক হলে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর ৫ম বর্ধমান জেলা সম্মেলনে একথা বলেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। এই সম্মেলনে কয়লা, ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং, কেবলস্, বিড়ি, রিক্সা ও ভ্যানচালক, পরিচারিকা সহ বিভিন্ন শিল্প ও পেশায় নিযুক্ত তিন শতাধিক প্রতিনিধি যোগ দেন। মূল প্রস্তাব পেশ করেন কমরেড এ চৌধুরী। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন কমরেড বাবলা ভট্টাচার্য। বক্তব্য রাখেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর বর্ধমান জেলা সম্পাদক কমরেড এ এল গুপ্তা, রাজ্য সহসম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য। সম্মেলন পরিচালনা করেন কমরেড বিশ্বপতি চ্যাটার্জী। কমরেড এ এল গুপ্তাকে সভাপতি এবং কমরেড বিশ্বপতি চ্যাটার্জীকে সম্পাদক করে ৩১ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

হাওড়া ঃ নিম্নচাপের কারণে সৃষ্ট প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে গত ১৩ সেপ্টেম্বর ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর হাওড়া জেলা দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে শ্রমিকদের ওপর পুঁজিবাদের বর্বর আক্রমণের বিবরণ দেন রাজ্য কমিটির সহসভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা। ট্রেড ইউনিয়নের রাজনৈতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা। কমরেড শঙ্কর রায়চৌধুরীকে সভাপতি এবং আলোক ঘোষকে সম্পাদক করে ২৬ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়। আসন্ন রাজ্য সম্মেলন সফল করার জন্য সকল কর্মী-সমর্থকদের উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান হয়।

পুরুলিয়া ঃ ১০-১১ সেপ্টেম্বর সাঁওতালডি তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প উপনগরীতে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর তৃতীয় পুরুলিয়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১০ সেপ্টেম্বর জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত দুই সহস্রাধিক সংগঠিত-অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক ও স্থানীয় জনসাধারণের যোগদানে মুখর হয়ে ওঠে প্রকাশ্য সমাবেশ। প্রধান বক্তা ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর অন্যতম সম্পাদক কমরেড অচিন্ত্য সিন্‌হা উপস্থিত শ্রমিক এবং জনসাধারণের কাছে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বর্তমান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সঙ্কট এবং সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের ফলে শ্রমিকদের দুরবস্থা এবং নির্মম শোষণ ও তার সাথে তথাকথিত বামপন্থী নামধারী রাজনৈতিক দল ও শ্রমিক সংগঠনগুলির বিশ্বাসঘাতকতা ও পুঁজির সাথে সমঝোতার কথা তুলে ধরে তার বিরুদ্ধে সঠিক আদর্শের ভিত্তিতে লাগাতার শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করার আহ্বান রাখেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য সহ সভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা, রাজ্য সহ সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য, পারবেলিয়া খনি অঞ্চলের বিশিষ্ট শ্রমিকনেতা কমরেড এস এস ঠাকুর এবং জেলা সম্পাদক কমরেড ডি কে মুখার্জী। আমন্ত্রিত শ্রমিক সংগঠনগুলির থেকে বক্তব্য রাখেন ওয়ার্কার্স পার্টির কমরেড কল্লোল ব্যানার্জী, টি ইউ সি সি'র কমরেড স্বপন মাহাথা। সভা পরিচালনা করেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর জেলা সভাপতি এবং বিশিষ্ট জননেতা কমরেড ভাস্কর ভদ্র।

১১ সেপ্টেম্বর মুক্তাঙ্গন হলে জেলার সংগঠিত শিল্প রেল, কোলওয়াশারী, বিভিন্ন কয়লা খনি, সাঁওতালডি থার্মাল পাওয়ার, রোপওয়েজ, বেরো গ্রানাইট এবং অসংগঠিত শিল্প বিড়ি, রিক্সাভ্যান, ইটভাটা, নির্মাণ শিল্প, স্পঞ্জ আয়রণ, সিমেন্ট, মুটে-মজুর, নিত্যযাত্রী, জনমজদুর, গালা, তাঁতশিল্প, পাথর ভাঙা শ্রমিক, পরিচারিকা প্রভৃতি ইউনিয়ন থেকে দেড়শত শ্রমিক প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। কমরেড ডি কে মুখার্জীকে সভাপতি, কমরেড এস এস ঠাকুরকে সহসভাপতি এবং কমরেড এম কে সিন্‌হাকে সম্পাদক করে ৪০ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

পুরুলিয়ায় ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সম্মেলনমুখী বিড়িশ্রমিকদের মিছিল

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর বর্ধমান জেলা সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন কমরেড এ এল গুপ্তা

নামখানায় আন্দোলনের চাপে

বাসভাড়া ৫ টাকার পরিবর্তে ৪ টাকা

নামখানা-বকখালি বাসরুটে সাধারণ বেসরকারি বাস মাত্র চারটি; তার মধ্যে দুটিই সাধারণত চলাচল করে। বাদবাকি সবই লাক্সারি বাস হিসেবে চিহ্নিত। লাক্সারির সুযোগ-সুবিধা না দিয়েও এগুলিতে লাক্সারি ভাড়া আদায় করায় লাভও বেশি।

এই বাসগুলিতে ন্যূনতম ভাড়া ৫ টাকা করা হলে এস ইউ সি আই তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে; গড়ে ওঠে 'সারা বাংলা পরিবহন যাত্রী কমিটি'র নামখানা শাখা। আন্দোলন তীব্র রূপ নিলে এস ডি ও হস্তক্ষেপ করেন এবং বর্ধিত ভাড়া স্থগিত থাকে। গত ১ সেপ্টেম্বর সেই বাড়তি ভাড়া পুনরায় চালু করলে পরিবহন যাত্রী কমিটির সদস্য বিভিন্ন ক্লাবের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ শুরু হয়। ৫ সেপ্টেম্বর নতুনবাজার মোড়ে যাত্রী কমিটির সদস্য মিলন সংঘের নেতৃত্বে পথ অবরোধ করা হয়। পুলিশ এসে ডাঃ স্বপন জানা সহ কয়েকজনকে থানায় নিয়ে আসে। পরদিন ৬ সেপ্টেম্বর ১০ মাইল মোড়ে প্রবাহ সংঘের অতনু রায়, মানবতীর্থ ক্লাবের সুনীল মাইতি, পঞ্চানন আদক, সমাজকল্যাণ সংঘের শুকদেব প্রধান, নিউ সানরাইজ ক্লাবের গোপাল প্রামাণিক সহ বহু সদস্য পথ অবরোধ করেন। পুলিশ এসে বহু অবরোধকারীকে গ্রেপ্তার করে। পরিবহন যাত্রী কমিটির নামখানা শাখা সম্পাদক কমলেন্দু পাণি তাঁদের জামিনে মুক্ত করেন।

এদিকে, যাত্রী প্রতিরোধের সামনে কর্মচারীরা বাস চালাতে অস্বীকার করেন। ফলে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। প্রশাসন হস্তক্ষেপ করে। ন্যূনতম ভাড়া ৫ টাকার পরিবর্তে ৪ টাকা এবং প্রতি স্টেজে ৫০ পয়সা হারে ভাড়া কমাতে মালিকপক্ষ বাধ্য হয়।

ব্যাঙ্ক কর্মচারী সম্মেলন

ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের দ্বিতীয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন ১০-১১ সেপ্টেম্বর কোচবিহারের ঠাকুর পঞ্চানন হলে অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ২০০ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

১০ সেপ্টেম্বর প্রকাশ্য অধিবেশনের প্রাক্কালে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের একটি সুসজ্জিত মিছিল পথ পরিক্রমা করে। প্রকাশ্য সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড অমর রায়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড এম সি ত্যাগী। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য-সভার প্রাক্তন সদস্য কমরেড দেবেন্দ্রনাথ বর্মন। প্রধান বক্তা ছিলেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য সভাপতি কমরেড সনৎ দত্ত। সংগঠনের ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যের নেতারাও এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

১১ সেপ্টেম্বর প্রতিনিধি সম্মেলনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন উপস্থিত করেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড জগন্নাথ রায়মণ্ডল। প্রতিবেদনের উপর প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। সংশোধন ও সংযোজনী সহ সম্পাদকীয় প্রতিবেদন সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। ইউকো ব্যাঙ্কের কমরেড অরূপ রতন সাহাকে সভাপতি, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কমরেড গৌরীশঙ্কর দাসকে সাধারণ সম্পাদক এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কমরেড বঙ্কিমচন্দ্র বেরাকে সম্পাদক করে ৩০ জনের কমিটি সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত হয়। প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানান কমরেডস্ শোভা বল ও জগবন্ধু বর্মন।

ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের ২য় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন। বক্তব্য রাখছেন কমরেড জগন্নাথ রায়মণ্ডল।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

কৃষি বিদ্যুতের মাশুল কমানোর দাবিতে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ

কৃষিতে ১০০ শতাংশ বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে গত জুলাই মাস থেকে কৃষকরা বিল বয়কট চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সরকারের অনড় মনোভাবের বিরুদ্ধে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে ২২ সেপ্টেম্বর ১৫ সহস্রাধিক কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহক হুগলি, নদীয়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং বীরভূম, বর্ধমান, পুরুলিয়া জেলা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায়।

হুগলি জেলার ২ সহস্রাধিক কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহক মিছিল করে জেলা শাসকের দপ্তরে পৌঁছালে পুলিশ বাধা দেয়। বিক্ষোভকারীরা পুলিশের বাধা অতিক্রম করে জেলা শাসকের দপ্তরে গেলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে হটিয়ে দেয়। লাঠিচার্জে ১৫ জন আহত হয়েছেন।

নদীয়া জেলার ৫ সহস্রাধিক কৃষক জেলা শাসকের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ জানাতে থাকলে এডিএম বিক্ষোভকারীদের ডেকে নিয়ে আলোচনা করেন। বর্ধমান জেলার কৃষকরা আইন অমান্য করেন।

মেদিনীপুর পূর্ব-পশ্চিম জেলা শাসকের দপ্তরেও কৃষকরা বিক্ষোভ দেখায়। পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা শাসকের অফিসে বিক্ষোভকারীরা তালা লাগিয়ে দিয়ে রাস্তা অবরোধ করে কয়েক ঘণ্টা বিক্ষোভ দেখিয়েছে। পুরুলিয়া জেলায় বিদ্যুৎগ্রাহকরা আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার বরণ করেন।

বাঁকুড়া জেলার বিক্ষোভকারীরা মিছিল করে পৌঁছালে সহকারী জেলা শাসক নেতৃবৃন্দের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন এবং তাঁদের দাবি বিবেচনা করার আশ্বাস দেন। বীরভূম জেলার ৩ সহস্রাধিক কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহক জেলা শাসকের অফিসের সামনে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

একইভাবে উত্তর ২৪ পরগণা ও মুর্শিদাবাদের জেলা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। হুগলিতে লাঠিচার্জের তীব্র নিন্দা করে অ্যাবেকার রাজ্য সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস বলেন, বামফ্রন্ট সরকার কংগ্রেস ও বিজেপির মতোই পুলিশ দিয়ে আন্দোলন দমন করার পথ নিয়েছে। তিনি জনসাধারণকে আন্দোলন তীব্রতর করার জন্য আবেদন করেছেন।

ইরান প্রশ্নে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থায় ভারতের ভূমিকা ন্যক্কারজনক

— নীহার মুখার্জী

আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার বৈঠকে ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকা ও ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের আনা প্রস্তাব, যার উদ্দেশ্যই হচ্ছে ইরানকে সাম্রাজ্যবাদীদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করানো ও তাদের হুকুম অনুযায়ী পরমাণু কর্মসূচি চালাতে বাধ্য করা, সেই প্রস্তাবকে সিপিএম-সিপিআই সমর্থনপুষ্ট ইউ পি এ সরকার যেরকম নগ্নভাবে সমর্থন জানিয়েছে, এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ২৬ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে তার তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, এই ঘটনা আবার প্রমাণ করল যে, ভারতের শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর সামগ্রিক স্বার্থের সেবা করার লক্ষ্য থেকে ভারত সরকার বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের চাপের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণে দ্বিধা করেনা। জি-৭ গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্তি, রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ ও ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের আধিপত্যবাদী আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতেই ভারত সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে তোষণের পথ নিয়েছে।

কমরেড মুখার্জী বলেন, সিপিএম, সিপিআই-এর তথাকথিত সমালোচনায় কংগ্রেস পরিচালিত সরকার আদৌ বিচলিত নয়, কারণ, তারা জানে, ভোট রাজনীতির বাধ্যতা থেকে এই দুটি দল মাঝে মধ্যে মেকি বিরুদ্ধতার মহড়া দেবে, কিন্তু কংগ্রেস সরকারকে পাঁচ বছর ধরে সমর্থন দিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি কখনই ভঙ্গ করবে না।

সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণমূলক অবস্থান পরিবর্তনে ভারত সরকারকে বাধ্য করার জন্য দেশব্যাপী শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে জনগণের প্রতি কমরেড নীহার মুখার্জী আহ্বান জানিয়েছেন।

সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের বাসভবনে আলোচনাসভা

১৭ সেপ্টেম্বর মহান মানবতাবাদী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১২৯তম জন্মবার্ষিকীতে হাওড়া জেলার সামতাবেড়েতে তাঁর বাসভবনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভার আয়োজন করে এ আই ডি এস ও, এ আই ডি ওয়াই ও এবং এ আই এম এস এস-এর হাওড়া জেলা কমিটি।

'বর্তমান সময়ে শরৎ সাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক আলোচনা সভার প্রধান বক্তা ছিলেন এ আই ডি এস ও'র রাজ্য সভাপতি কমরেড সুব্রত গৌড়ী।

আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন আকাশ-বাণীর সাংবাদিক মহম্মদ মহসীন, স্থানীয় ব্লক কৃষি আধিকারিক ডঃ সফিউল আলম, 'সংকেত' পত্রিকার সভাপতি বিমান মণ্ডল। সভায় সভাপতিত্ব করেন এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষক অমলেন্দু পাঁজা।

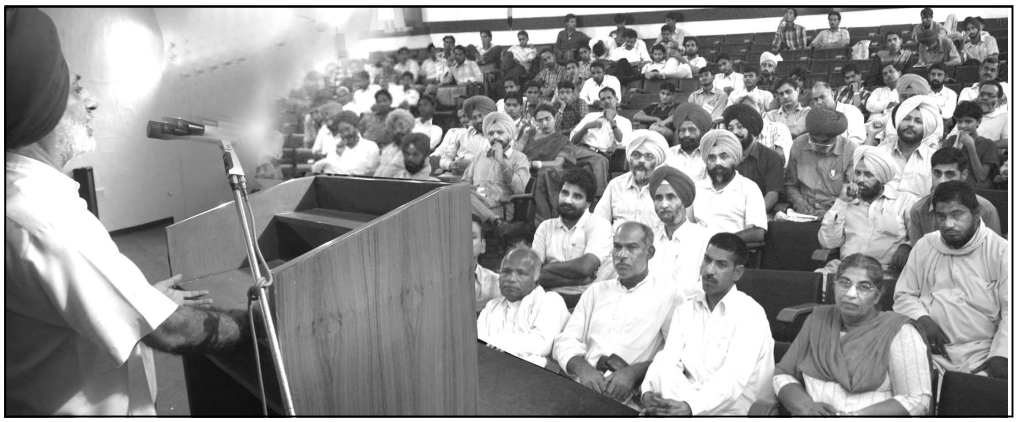

১১ সেপ্টেম্বর পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংলিশ অডিটোরিয়ামে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত শিক্ষা কনভেনশন। এই কনভেনশনে চণ্ডীগড়, পঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু এবং লাদাক থেকে ছাত্র শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীরা অংশগ্রহণ করেন।

সরকার বলে টাকা নেই, অথচ চুরি চলছে অবাধে

রাজ্যের উন্নয়ন নিয়ে সরকার যতই ঢাকঢোল পেটাক, বাস্তবে উন্নয়নমূলক খাতে সরকারি বরাদ্দ কমছে। সরকার অর্থাভাবের যতই অজুহাত দিক, বাস্তবে বিভিন্ন দপ্তরে সরকারি টাকা তছরূপ, আত্মসাৎ এবং অপচয়ের বন্যা বইছে। সেই অপচয়েরই অতি সামান্য নমুনা ধরা পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অডিট রিপোর্টে। এই রিপোর্ট বলছে —

১। দুধ বিতরণে বিভাগীয় ভ্যানগাড়িগুলির ৫০ শতাংশ ব্যবহার করতে না পারায় কলকাতার সেন্ট্রাল ডেয়ারির ক্ষতি ১·০১ কোটি টাকা

২। বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও পুরুলিয়া জেলা হাসপাতালে অপচয় ১·০২ কোটি টাকা

৩। রাজারহাট নিউটাউন প্রকল্পের ঋণের সুদ বাবদ ভর্তুকি ২৭·০৭ কোটি টাকা

৪। আইনের তোয়াক্কা না করে মিউচুয়াল ফাণ্ডে বিনিয়োগের জন্য হলদিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ক্ষতি ১·২৭ কোটি টাকা

৫। অর্ডার দেওয়া ত্রিপল না নেওয়ায় ত্রাণদপ্তরের ক্ষতি ৯৯·০৩ লক্ষ টাকা

৬। নিম্নমানের আলু কেনা ও দেরিতে বিক্রি করায় বেনফেডের ক্ষতি ৭৪·৬৯ লক্ষ টাকা

৭। ভাইরাস আক্রান্ত পশু আমদানি করায় ক্ষতি ৮৩·০৫ লক্ষ টাকা

৮। আলিপুর সরকারি ছাপাখানায় এক মামলা তদারকিতে বিলম্বের জন্য নিষ্ফল ব্যয় ৬২·৬৫ লক্ষ টাকা

৯। হাওড়া জেলায় খাবার অযোগ্য মিড-ডে মিলের চাল সংগ্রহের জন্য ক্ষতি ৩৪·৫৪ লক্ষ টাকা

১০। রাজ্য সরকার রাজপথ মণ্ডল ৫-এ দূরত্বের কারচুপি করে ঠিকাদারদের বাড়তি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে ৯৪·৫৮ লক্ষ টাকা

১১। নির্বাহী বাস্তুকারেরা চুক্তির শর্ত না মেনে ঠিকাদারদের পাইয়ে দিয়েছে ৫·৪৭ কোটি টাকা

১২। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ কর্তৃক বন্যারোধ ও বনাঞ্চল ক্ষয়রোধে বাঁধের কাজ অসমাপ্ত রাখায় নিষ্ফল ব্যয়জনিত ক্ষতি ৬৬·৪৩ কোটি টাকা

১৩। দীঘায় নর্দমা ও পয়ঃপ্রণালীর প্রকল্প পরিবর্তন করায় অপচয় ৪·৬৩ কোটি টাকা

১৪। সরকারি নিয়ম লঙ্ঘন করে গাড়ি ভাড়ায় অনিয়মিত ব্যয় ১·০৮ কোটি টাকা

১৫। জাতীয় সড়কের কাজে অধিগৃহীত জমির মালিকদের জন্য ক্রীত জমি কাজে না লাগায় ক্ষতি ১·১৫ কোটি টাকা

১৬। জেনারেল ফিনান্সিয়াল রুলস অমান্য করে তহবিলের অপব্যবহার ১·৬৪ কোটি টাকা

১৭। ট্রেজারি আইন না মেনে আদায়ীকৃত রাজস্ব সরকারের ঘরে জমা না দেওয়া এবং তার থেকে খরচ ১·০৪ কোটি টাকা

জনগণের টাকা তছরূপের তালিকায় আরও বহু বিষয় আছে।

[ক্যাগ রিপোর্ট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০০৩-০৪]

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in